কড়া পাক

অপর্ণা ভট্টাচার্য

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ১৯৬১

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ও অঙ্গবিন্যাস
দেবাশিস দেব

মুদ্রক
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিন্টার্স
৩২, বিডন রো
কলিকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ওয়েলনোন্ প্রিন্টার্স
রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৯

হাঁড়ি কড়া হাতা খুন্তি কুটনো বাটনার আবর্তে যাদের প্রতিভা
হারিয়ে যায় আমার কড়া পাক সেই মহিলাদের উদ্দেশ্যে
অর্পণ করলাম।

পরিপাকের পূর্বকথা

কড়া পাক সন্দেশ মুখে দিলে সহজেই গলে যায় না। আস্বাদন করতে করতে সরস হয়। তারপর ভিতরের রসটুকু এক সময় বেরিয়ে এসে রসনা মধুর করে তোলে। এই বই-এর রচনাগুলি অনেকটা সেই কড়া পাক সন্দেশের মত। উপরের কড়া আবরণের মধ্যে রয়েছে এর প্রকৃত বক্তব্য। সেটুকু বেরিয়ে এলে তবেই সুস্বাদু লাগবে।

রম্য রচনা লেখার কোন নির্দিষ্ট রীতি আছে কিনা আমার জানা নেই। যা রমণীয় করে তাই তো রম্য। এই লেখাগুলি সরস ও রম্য হয়েছে কিনা তা বিচার করার দায়িত্ব যারা উপভোগ করবেন তাদের। শুনেছি, সাহিত্যের কঠিনতম বিভাগ নাকি রম্য রচনা। সচেতনভাবে সেই কঠিন পথ বেছে নিয়েছি তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আজকের সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত অনেকেই তো এই পথ ধরে হেঁটে চলেছেন। আমি অজান্তেই সেই পথে এসে পড়েছি। সেই যে ছাত্রাবস্থায় কমলাকান্ত মনকে নাড়া দিয়েছিল, তার রেশ কাটেনি আজও। আফিংখোর কমলাকান্তের নেশার ছোঁয়াচ ঘোর এনেছে মনে। আর সেই ঘোরের মধ্যেই শুরু হয়েছে চলা। লেখার সময় কমলাকান্ত মনশ্চক্ষুর সামনে এসে ইশারা করেছে বার বার। তাকে অনুকরণ না করলেও অনুসরণ করেছি নিঃসন্দেহে। অবশ্য কমলাকান্তের মার্গ ধরে ঠিকমত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব তেমন সুনিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে চলা শুরু হয়নি। আমার শুধু পথ চলাতেই আনন্দ—লক্ষ্যের দিকে লক্ষ্য রাখার অবকাশ কই?

আমাদের আজকের অন্তঃসারশূন্য আর্থ-সামাজিক পরিবেশ আর বাগাড়ম্বরসর্বস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রতিনিয়ত মনকে বিষণ্ণ করে তোলে। অতি দুঃখে মানুষ যেমন অনেক সময় হাসে, এখানেও তেমনি ব্যঙ্গ কটাক্ষের আড়ালে রয়েছে এক গভীর ব্যথার সুর। অবক্ষয়ী সমাজের রূপ কান্নার পরিবর্তে হাসার ইচ্ছেই জাগিয়ে দেয়। বিদ্রূপ করবো কাকে? আমরা সবাই যে নিজেকেই নিজে ঠাট্টা করে চলেছি।

এই লেখাগুলির মাধ্যমে সেই ব্যঙ্গের বুড়ো আঙুল দুটি নিজের বুকেই তাক করেছি। আয়নায় নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে মুখ ভ্যাংচালে যেমন হয় আর কি। সবাই যদি নিজের বুকের আরশিতে এমনি করে মুখব্যাদান করতে শুরু করে তবেই হয়তো বুঝতে পারবো আমাদের সমাজের মুখ আজ কত কদাকার হয়ে গেছে।

সূচীর অন্তর্গত অনেকগুলি রচনা এর আগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তবুও আমি সুপরিচিতা লেখিকা নই। পুস্তক বিপণি বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। ব্যঙ্গচিত্র শিল্পী শ্রীদেবাশিস দেব এই বই-এর চিত্রগুলি এঁকে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রচ্ছদও এঁকেছেন তিনি। তাঁকে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে ঋণ শোধ করা সম্ভব নয়। আর এই বইটির আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে সমস্ত যোগাযোগ ও ব্যবস্থাপনা যারা করেছে সেই বাবু (জ্যোতি মুখোপাধ্যায়) ও মদনের (মদনলাল রায়) সঙ্গে আমার ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানাবার সম্পর্ক নয়। ওদের একদিন নিজের হাতে তৈরী কড়া পাক সন্দেশ ও পায়েস খাইয়ে দিলেই ওরা খুশী হবে। কলমের রান্নার চেয়ে হাতা-খুন্তির রান্নাই ওদের বেশী পছন্দ।

সমাজের অলিখিত নির্দেশে খুন্তি চালানোটা যাদের কাছে প্রায় বাধ্যতামূলক, সেই হাতে কলম ধরাটা বড় সহজ কাজ নয়। আশাপূর্ণা দেবীদের মত কয়েকজন ব্যতিক্রম আজও। তাই আমার এই কড়া পাক পরিবেশনের পিছনেও আছে উজানের উল্টো দিকে চলার অদম্য প্রয়াস। দুধ জ্বাল দিয়ে, ছানা কাটিয়ে, সন্দেশ তৈরী করায় যে অভ্যস্ত স্বাচ্ছন্দ্য. কলমের কড়া পাক রচনায় তেমন রন্ধন পটীয়সীর পরিচয় দিতে পেরেছি কিনা তা পাঠক-পাঠিকারা বলুন।

অপর্ণা ভট্টাচার্য

সূচীপত্র



সমাজে যারা নিজেদের পরিশীলিত রুচির
প্রতি আস্থাবান

শারদীয়া

তখন ভিজে আকাশের বুকে সবেমাত্র নীলের আভা ফুটে উঠেছে। রোদের রং হয়েছে নতুন বৌ-এর গয়নার মত ঝক্‌ঝকে। সবুজ মাঠের ধারে সরু লিক্‌লিকে কাশের শিষ গজিয়ে উঠছে ঝাঁকে ঝাঁকে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই সেই সুকুমার রায়ের "উঠছে হাসি ভস্‌ভসিয়ে সোডার মত পেট থেকে," কবিতার লাইনের মত কাশ ফুলের ফুস্‌ফুসে সাদা হাসি ছড়িয়ে পড়বে সারা মাঠে। আকাশবাণীর সকাল ৭-৪০ মিনিটের রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে, "বাদল ধারা হল সারা" গানের পালা শেষ হয়ে বাজতে শুরু করেছে, "আমার রাত পোহাল শারদ প্রাতে" বা "শরত আলোর কমল বনে"। অর্থাৎ ক্যালেণ্ডারের পাতায় চোখ তুলে না তাকিয়েও আপনি অনায়াসে বেশ অনুভব করতে পারছেন, শরৎকাল এসে গেছে।

হ্যাঁ, সেই শরৎকাল। গ্রীষ্ম নয়, বর্ষা নয়, হেমন্ত নয়, এমন কি বসন্তও নয়। বাঙালীর বড় আদরের, বড়ই আকাঙ্ক্ষার শরৎকাল। সারা বছর তো এই ঋতুটির জন্যই আমরা চিত্তপিপাসিত হয়ে বসে থাকি। আমাদের মরুভূমিময় জীবনে এই শরৎকালটিই যে একমাত্র মরূদ্যান।

শুরুতেই, রোজ সকালে যে দারিদ্র্য-জীর্ণ বৃদ্ধ লোকটি আপনার খবরের কাগজ দিয়ে যায়, সে এসে জিজ্ঞেস করে "এবারে কি কি শারদীয়া দেব, বাবু?" আপনি সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "এবার কত করে হয়েছে?" দাম শুনে আপনি একটু বিমনা হয়ে রইলেন। কিন্তু শারদীয়া সংখ্যা যে আমাদের প্রিয় শারোদৎসবের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছে, না নিয়ে উপায় কী? আপনি খান দুই বিশিষ্ট শারদীয় সংখ্যা দেবার জন্য বললেন। পাশে বসে আপনার বালক পুত্র স্কুলের হোমওয়ার্ক করছিল, সে বললে, "আমার জন্য একটা 'খুশীর মেলা' দেবার কথা বলে দাও, বাবা।" আপনি

সস্নেহে ছেলের দিকে তাকিয়ে সেটারও অর্ডার দিলেন। আপনার পাশের ফ্ল্যাটের বোসবাবুর স্ত্রী তাঁর দিবানিদ্রায় স্ফীত বিপুলা বেপথু দেহটি নিয়ে গত মাসের কাগজের বিল মিটিয়ে দিতে দিতে বললেন, "আমাদের এবার শারদীয়া 'রহস্য ও রোমাঞ্চ' আর 'চিত্রলোক' দেবেন কিন্তু।" বৃদ্ধ কাগজওয়ালা বললো, "না মা, 'চিত্রলোকের' কথা বলতে পারি না, মা! এবার অনুপম কুমারের ছবি ও জীবন কাহিনীর জন্য আশি হাজার কপি এখনই বুক হয়ে গেছে।"

শরৎকাল আসতে আসতেই ওদিকে রেকর্ডের গানের বাজারে যেন সরগম শুরু হয়ে যায়। বছরের সুপার হিট, "কিনে দে রেশমী চুড়ি," "সাদের লাউ বানাইল মোরে বৈরাগী," "বড়লোকের বিটি লো লম্বা লম্বা চুল" ইত্যাদি গানের রেকর্ড ও ক্যাসেট কেনার জন্য আধুনিক আধুনিকাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অন্যান্য গানের বিক্রীর মরশুমও প্রায় এইটেই। তবে এ সবের ক্রেতারা একটু ভিন্ন শ্রেণীর। সমাজে যাঁরা নিজেদের পরিশীলিত রুচির প্রতি আস্থাবান, যাদের ড্রইংরুমের শোকেশে শুধু পুতুলই সাজান থাকে না, দু' তিনটি কাঁচের আলমারিতে সাহিত্য বিষয়ক বই, বিভিন্ন সংসদ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী বা কবিতার বই সাজান থাকে,— রেকর্ডের গানের বাজারে দেখা যায়, এঁদের চাহিদা—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রভৃতি গানের। তবে তুলনামূলকভাবে এই চাহিদা এত সীমিত যে রেকর্ড কোম্পানী আজকাল একখানা সুপার সেভেন রেকর্ডে তিনজন শিল্পীর গান বাজারে ছাড়ছেন। আরেক দল ক্রেতাও আছেন—এঁদেরও আরেক ধরনের সংস্কৃতিবান রুচির আত্মাভিমান আছে। এঁরা বাজারে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, রবিশঙ্করের পরমেশ্বরী রাগের এল.পি-টা আছে কি?" কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল দোকানদারকে প্রায়ই মিষ্টি হেসে বলতে শোনা যায়, "কোথাও পাবেন না, এ সব রেকর্ড আজকাল বিদেশে চালান হয়ে যায়।" স্বদেশের মানুষের বিরাগে রাগসঙ্গীত

আজকাল বিদেশেই আসর জমাতে শুরু করেছে ; আর পরিবর্তে বিদেশী পপ্ সুরে গাওয়া চলতি গান তীব্র এ্যমপ্লিফায়ারের মাধ্যমে কোলাহল তোলে আমাদের উৎসবের মঞ্চে।

শারদীয়া আমেজ এসে লাগে সমাজের তথাকথিত হোয়াইট-কলার্ড মহলেও। বেসরকারী ফার্মের এক্সিকিউটিভ, সদ্য বিদেশ প্রত্যাগত ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি এঁদেরও কেনাকাটার সময় প্রায় এইটেই। বর্তমান যুগের "status symbolic" জিনিষ ও আসবাবপত্র ঘরে না থাকলে এঁদের মিসেসরা সঠিকভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারেন না, তাঁদের সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়। তাই গত বছর যাঁর ফ্রিজ হয়েছে, এবারে তাঁর টেলিভিশন্ হয়, যাঁর ষ্টিরিও হয়েছে তাঁর রেকর্ডার হয়। এমনি করেই পুজোর গ্র্যাণ্ডে সেলে সকলের ঘরেই আসে ইলেকট্রিক গ্রাইণ্ডার, হটকেস, ওভেন, ক্যামেরা, ভিডিও, ভি.সি. আর. ইত্যাদি। আর যাঁর অনেক আগেই সব হয়ে গেছে, তিনি পুরনো ডাইনিং সেট বদলে নতুন মডেলের সেট কেনেন অথবা ড্রইংরুমের কার্পেট ডাইনিংরুমে পেতে ড্রইংরুমের জন্য নতুন কার্পেট কেনেন।

তবে যতই বলুন, পুজোর বাজারের আসল রঙের খেলা কিন্তু পোষাকের বাজারে। সেদিন বাজারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়লো, লাল সালু কাপড়ে রুপালী অক্ষরে লেখা একটি ফেস্টুন টাঙ্গানো রয়েছে এক কাপড়ের দোকানে, তাতে লেখা নতুন ধরণের একটি কবিতা—

"সবারে করি আহ্বান,
এস উৎসুক চিত্ত, এস আনন্দিত প্রাণ।"

আপনি বলবেন, আরে এতো রবীন্দ্রনাথের গান। আমিও তা জানি মশাই, আর এও জানি ঐ একটি নাম ভাঙ্গিয়েই আজও আমরা আমাদের প্রদেশের বংশ কৌলিন্য রক্ষা করে চলেছি। তারপরের লাইনগুলো শুনুন—

"দীনের এ ভাণ্ডারে সঞ্চিত সম্ভার
করিবে চিত্ত জয় সবাকার,
এসো ওগো পুরনারী—বাল, যুবা, বুড়াবুড়ি,
সগৌরবে করহ পদার্পণ।"

অন্যায় কি হয়েছে বলুন? রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্র সহ যদি ব্লেডের বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে তবে কাপড়ের দোকান পিছিয়ে থাকবে কেন?

তা এই সব কাপড়ের দোকানে সত্যিই যাঁরা সগৌরবে পদার্পণ করে থাকেন তেমনি এক চপলা মাসীমার বাড়ীতে সেদিন বিকালে বেড়াতে এলেন পাড়ার সাবিত্রী মাসীমা।

"—কি দিদি! পূজার বাজার শেষ হইল?"

"আসেন, দিদি! বসেন! যা দিনকাল পড়ছে এই হইল কোনোরকমে। আগেরকার কাল কি আর আছে, দিদি। আমাগোর ছোটবেলায় দেখ্‌ছি, আমার পিসামশায়, তিনি থাইকতেন কলকাত্তায়—পূজার বাজারের টাকা যাইত তাঁর কাছে। তিনি গাঁইট ভইর‍্যা বাজার আনতেন সক্কলের লগে। ষষ্ঠীর দিন বৈকালে ঠাকুরদাদা আর ঠাকুরমা দালান ঘরের বারান্দায় বইস্যা বাড়ীর বৌ ঝি, পোলাপান সক্কলেরে হাতে কইর‍্যা কাপড় দিতেন। চাকর, ঝি, রাঁধুনী, বামুন, ধোপা, নাপিত, মেথর তাগো কাপড়ের, সঙ্গে দিতেন পূজা দ্যাখনের বকশিস্, মুড়ির মোয়া, চিড়ার লাড়ু, ওখ্‌রো কত কি। তাই কি আজকাল আমরা পারি, দিদি, কন্? অ লিলি! তোর মাসিমারে পূজার বাজার দেখা।" চপলা মাসীমার কলেজে পড়া মেয়ে চুড়িদার কামিজ পরে, গলায় দোপাট্টা জড়িয়ে এসে দাঁড়ালো। প্লাক্ করা ভ্রূ নাচিয়ে বললো—"আলমারির চাবি দাও।"

চপলা মাসীমারাও বঙ্গ-বিভাগের পরেই এদেশে এসেছিলেন। দেশে থাকতে তাঁদের বাড়ীতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন থেকে চার দিন ধরে, ঢাক ঢোল বাজিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে মহালক্ষ্মীর পুজো হ'তো। পুজোর শেষে চতুর্থ দিনে চপলা মাসীমার শ্বশুর লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে ধান ভরে, কড়ি ও রুপোর টাকা রেখে নতুন লাল সালু কাপড় জড়িয়ে রুপোর শিকল দিয়ে তাকে বাঁধতেন, তারপর

তেল সিঁদুর লাগিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে, সেই ঝাঁপি লোহার সিন্দুকে তুলে রাখতেন। চপলা মাসীমাদের চার পুরুষের সেই শৃঙ্খলিতা মহালক্ষ্মীর এখনও তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারেন না। ভিটে মাটি ত্যাগ করে এসে চপলা মাসীর স্বামী বরদাবাবু প্রথমে ছোট্ট একটা ঘুমটি দোকান করে বসেছিলেন রাস্তার পাশের জবরদখল জমিতে। কিন্তু বলতে নেই, কয়েক বছরের মধ্যেই বরদাবাবুর মস্ত কারবার হয়েছে, হয়েছে তিনটে ট্রাক, দুটো বাস, চারতলা বাড়ী। বড় ছেলেও এখন ফলাও ব্যবসা করছে। আর বন্দিনী সেই মহালক্ষ্মী এখনও চপলা মাসীমার শোবার ঘরে খাটের পাশে সেই সিন্দুকটিতে রাখা আছে।

এহেন চপলা মাসীমার পুজোর বাজার এনে লিলি খাটের উপর রাখলো। শাড়ীর প্যাকেট খুলতে খুলতে চপলা মাসী বললেন— 'বড় পোলায় এবার সগ্গলেরে বালুচরী শাড়ী দিছে। আচ্ছা কন্ তো দিদি, আমার কি এখন এই জমকালো শাড়ী পরনের বয়স আছে? তা পোলায় শুনবো না। এইটা বড় বৌমার শাড়ী, সাড়ে বারশ টাকা দাম নিছে ২০% পারসেণ্ট রিবেট বাদ দিয়া।'

দাম শুনে সাবিত্রী মাসীমার চোখ অজান্তেই বিস্ফারিত হয়ে যায়। কিন্তু চপলা মাসী তাঁর দশগাছা সলিড্ সোনার চুড়ি পড়া হাত ঘুরিয়ে বললেন—"তাও তো ঐ জগন্মাতা বস্ত্রালয় থিক্যা কিন্‌ছে কইয়া দাম একটু সুবিধায় পাইছে—অগো সঙ্গে আমাগো কাজ কারবার চলে তো, কাজলা ষ্টোর হইলে তো চৌদ্দশ টাকা দাম হইত।"

পুরানো ঐতিহ্য বজায় রেখে চপলা মাসীমা তাঁর ঠিকে ঝি চাঁপার জন্য একটা ডুরে তাঁতের শাড়ী, রাঁধুনী গোপালের মা'র জন্য এক-জোড়া থান ধুতি আর ফাইফরমাস খাটার বাচ্চা চাকর শম্ভুর জন্য একটা জামা প্যাণ্টও কিনেছেন। চাঁপার শাড়ীটা হাতে নিয়ে চপলা মাসীমা বললেন "কি দিন কাল হইল, দিদি! আগে এসব কাপড়

আট টাকা, ন টাকায় পাইছি, এখন দাম কয় চল্লিশ টাকা। তাও অনেক দরাদরী কইর‍্যা ত্রিশ টাকায় দিছে।"

বাজার দেখে সাবিত্রী মাসীমা একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চেপে নিয়ে উঠলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে ব্যাঙ্কে কাজ করে, ছেলের বৌ একটা মেয়েদের স্কুলে পড়ায়। ছেলের বৌ এবারও চারশ টাকা দিয়ে একটা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ী কিনেছে বলে মনে মনে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। প্রতি বছর এত দামের শাড়ী কেনার দরকার কী? তাঁদের কালে তো কই এসব ছিল না। তখন সকলের জন্য সমান দামের হয় ফরাসডাঙ্গা, নয় শান্তিপুরী শাড়ী আসতো। তাই পেয়েই তাঁরা কত খুশী হতেন, সন্ধিপুজোর সময় সকলে নতুন কাপড় পরতেন। কালে কালে একি হল? এখন হঠাৎ ঘরে বাইরে সমান পরিশ্রম করা তাঁর ছেলের বৌ-এর ম্লান ক্লান্ত মুখখানা মনে করে তাঁর বুকটা টনটন করে উঠলো।

যাওয়ার পথে রান্না ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি মেরে গোপালের মা ডাকলো, "অ মাসীমা! পুজার বাজার দ্যাখলেন কুনি?" এতক্ষণ চেপে রাখা সেই দীর্ঘশ্বাসটা ছেড়ে সাবিত্রী মাসীমা বললেন, "হ্যাঁ বাছা, তোমাদের সব বড়লোকের বড় বড় ব্যাপার।" থোনু, কইছিলাম, মা! আমার গোপালের লগে একটা জামা পেনু দিয়েন। তা কইলেন, 'আর সামর্থ্যে কুলায় না গো বাপু'— দেখি, গেল মাসের টাকাটা দিলে আমু কিন্যা দিমু পোলাডার একটা জামা আর পেনু।"

পঞ্চমীর দিন সকালে অনেক ঘুরে অনেক দরদস্তুর করে, ফুট-পাতের দোকান থেকে গোপালের মা তার ছেলের জন্য কেনে একটা সার্ট প্যান্ট। এমনি করেই ষষ্ঠীর দিন সকালে পুজোর বাজার সারে সরকারী অফিসের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী হৃদয়নাথ ঘোষও। বৌ-এর জন্য একটা ছাপা শাড়ী, ছেলেমেয়ের জন্য সস্তা ছিটের জামা প্যান্ট, এক জোড়া করে কাপড়ের কেডস্ জুতো। সখ করে হৃদয়নাথ একটা সস্তার স্নো ও এক শিশি সেন্টও কেনে। আর মেয়েকে দেয়

একটা পুঁতির মালা, এক গজ মাথার রিবন, ছেলের জন্য কেনে একটা চট্‌পটি ফুটানর বন্দুক। সব শেষে বৌ-এর পীড়াপীড়িতে হৃদয়নাথ নিজের জন্য একটা সার্ট কিনতেও বাধ্য হয়। কিন্তু অফিস থেকে পুজো এ্যাডভান্স বলে যে একশ আশি টাকা পেয়েছিল তাতে হৃদয়নাথের বাজার কুলোয় না, আরও গোটা শ'খানেক টাকা বেশী খরচ হয়ে যায়। তা যাক্। তবু তো পুজোর ক'টা দিন হাসি ফুটবে হৃদয়নাথের ছেলে মেয়ের মুখে। আর সস্তা সেন্ট মেখে হৃদয়নাথ যখন বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে হেঁটে হেঁটে এ পাড়া, ও পাড়া ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়াবে, তখন আলোর রোশ্‌নাই আর প্যাণ্ডেলের ডেকোরেশন্ দেখে বিস্ময়ে বোবা হয়ে যাবে। সারা বছর ধরে তো শুধু এইটুকুর জন্যই অপেক্ষা করে থাকা।

ওদিকে চপলা মাসীমার ছেলের বৌ যখন সাড়ে বারশ টাকা দামের শাড়ী দেখিয়ে পুজো প্যাণ্ডেল থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে, তখন আধুনিক ফেডেড জিনস পরা বব্ চুলের শীর্ণ এক তরুণ তার সামনে বাড়িয়ে ধরবে কাগজের ব্যাণ্ডেজ জড়ান একটা কৌটো —গায়ে লেখা "বন্যার্তদের জন্য মুক্ত হস্তে দান করুন"। চপলা মাসীমার ছেলের বৌ তার জড়ির কাজ করা হ্যাণ্ড ব্যাগ খুলে অনেকগুলো একশো টাকার নোটের পাশ থেকে একটা পঁচিশ পয়সা খুঁজে বের করে কৌটোর মধ্যে ফেলে দেবে। ঠিক সেই সময়ে যদি লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, মা দুর্গার মূর্তির ঠোঁটের কোণে একটু মুচ্‌কি হাসি ফুটে উঠেছে। তিনি তো মনে মনে ভাল করেই জানেন, পুণ্য করার লোভে চপলা মাসীমার ছেলের বৌদের মত বৌ মেয়েরা যে দশ নয়া, পাঁচ নয়া পয়সাগুলো কৌটোয় ফেলছে তার ক'টা আসল বন্যার্তদের কাছে পৌঁছবে?

তাই এ যুগের এক যুধিষ্ঠিরকে যখন ধর্মরাজ জিজ্ঞেস করলেন, —"ওহে বল তো। সবচেয়ে আশ্চর্য কী?" সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তখন উত্তর দিলেন, "সত্যি বলছি, ঐ কাগজওয়ালারা যতই না

কেন ফলাও করে লিখুক, বন্যায় আটান্ন লক্ষ লোক বিপন্ন রেল দুর্ঘটনায় নিহতদের সংখ্যা তিনশো, ভূমিকম্পের বলি পঞ্চান্ন হাজার, পাহাড়ী অঞ্চলে ধ্বসে দেড়শো লোকের জীবন্ত সমাধি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হতাহত পাঁচশো, বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য ক্ষুদ্র শিল্পের বিপর্যয়, চিনির কালোবাজারে পনেরো টাকায় এক কিলো, আলু উধাও—ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তবুও আমরা ঠিক জানি, আমাদের শারদীয়া বাজারে অন্ধকার নেমে আসবে না কখনই। কেননা, "মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি। ইতি আশ্চর্য্যম্"।



বছরের একটা সময়ে নৌকোর প্রয়োজন অনেক
বড় বড় শহরেও দেখা যায়

নব্য অন্নদামঙ্গল উপাখ্যান

"ঈশ্বরীরে সম্বোধিয়া কহেন ঈশ্বরী
শুন হে ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি"

ঈশ্বরী পাটনীর জাত ব্যবসা ছিল খেয়া পারাপার করা। কিন্তু কয়েক প্রজন্ম পরে সে যখন নতুন জন্মলাভ করল, তখন নদীমাতৃক বাংলা দেশের ভোল আমূল পাল্টে গেছে। বাংলা দেশটাই ভেঙ্গে দু'টুক্‌রো—এ পারের বাংলাদেশ এখন পশ্চিমবঙ্গ। গাঁয়ে গঞ্জে এখন আর নৌকো পারাপারের চল্‌ নেই। নদীগুলোর উপর তৈরী হয়েছে বড় বড় সেতু, হয়েছে পাকা পিচ ঢালা রাস্তাঘাট। সেই সেতুর উপর দিয়ে চলেছে সরকারী বেসরকারী নানা ধরণের বাস, ট্রাক, ভ্যানগাড়ী, মিছিলের মত। বাসগুলোতে ছাগল, মুরগী, হাঁস পাখী, মালের বস্তার সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে মানুষ চলেছে গাঁ থেকে শহরে, শহর থেকে গাঁয়ে। গাঁ এবং শহরের মধ্যে যে পি· ডব্লু ডি-র রাস্তা এমন বন্ধনহীন গ্রন্থি বেঁধে দিয়েছে তা দেখে ঈশ্বরী পাটনী একটা পরম তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিল। কিন্তু সমস্যা, তার জীবিকা এখন কী হবে? অবশ্য বছরের একটা সময়ে নৌকোর প্রয়োজন অনেক বড় বড় শহরেও দেখা দেয়। কেননা প্রকৃতির গতিতে হস্তক্ষেপ করে আমাদের বিজ্ঞানের জয়-ধ্বজা প্রায় আকাশ ভেদ করে উঠেছে। খরস্রোতা নদীকেও আমরা বাঁধের বন্ধনে বেঁধেছি। কিন্তু একে তো অপরিকল্পিত কাজে নানা ত্রুটি, তার উপর বরাদ্দ অর্থে ঠিকাদার, সাপ্লায়ার, কনট্রাক্টর থেকে শুরু করে উপরওয়ালা কর্মকর্তা পর্যন্ত যে অতি সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ ভাগ চলে তাতে বাঁধের ভাগ্যে এক দশমাংশও জোটে কিনা সন্দেহ। ফলে হামেশাই সে সব বাঁধের বন্ধন টুটে যায় এবং বর্ষার সময়ে জল সংরক্ষণের অপ্রশস্ত আধারগুলি যখন উথলে ওঠে তখন হাজার হাজার কিউসেক্‌ জল ছাড়তে বাধ্য হওয়ার ফলে এমন অনেক

জায়গায় আজকাল স্বেচ্ছা মৃত্যুর মত স্বেচ্ছা প্লাবন সৃষ্ট হয়, যেখানে আগে কখনও বন্যার সম্ভাবনার কথা কল্পনাও করা যায়নি, "এক বুন্দ পানীর" জন্য যে রাজস্থান চিরকাল হাহাকার করেছে সেখানেও তাই বন্যার তাণ্ডবলীলা মানবের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়েছে। এই বন্যার সময় শহরের পাকা রাস্তাতেও নৌকো চলে জলবন্দী মানুষের উদ্ধারকার্যে। কিন্তু ঈশ্বরী ভাবলো বছরের ঐ একটা সময়ে সে আর কতই বা কামাতে পারবে যাতে তার সারা বছরের পুরো খরচ-খোরাক চলবে। ঈশ্বরীর এক বন্ধু নাকি তাকে বলেছিল, বরং ঐ বন্যার সময় কোনো ত্রাণ শিবিরের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাওয়া অনেক লাভজনক। দেশ বিদেশ থেকে যে সমস্ত ত্রাণসামগ্রী ও সাহায্যের অর্থ আসে তার সবই প্রায় নিজেদের পকেটে চলে গিয়ে আসল ত্রাণ লাভ করে। দেব-সঙ্গ করা ঈশ্বরীর তা পছন্দ নয়।

অনেক ভেবেচিন্তে ঈশ্বরী একটা ট্যাক্সি কিনে চালাবে স্থির করলো, এতে তার পারাপার করার জাত ব্যবসাটাও বজায় থাকবে। ট্যাক্সি কেনার টাকা জোগাড় করার জন্যও তাকে কম কষ্ট করতে হয়নি। শেষপর্যন্ত সে তাদের অঞ্চলের বিধান সভার সদস্য ভদ্রলোকটির প্রায় পিছু নিয়েছিল। নির্বাচনের সময় ঈশ্বরী ঐ ভদ্রলোকের জন্য প্রচণ্ড খাটাখাটনী করেছিল। ভোটে জেতার পরে অবশ্য সদস্যটি তাকে না চেনার ভান করে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরী পাটনীর জন্মান্তরের বৈঠা চালানো হাতের পেশী ও গুলি দেখে সদস্য ভদ্রলোক তাকে আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করেননি। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে তার লোনের এবং পারমিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেই লোনের টাকায় ঈশ্বরী একটা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড এ্যামবাসাডার গাড়ী কিনে নিজেই চালায়। ইচ্ছে লোনের টাকা শোধ করার আগে আরও একটা গাড়ী কিনবে। যতদিন ঐ সদস্য দাদা ক্ষমতায় আছেন ততদিন তো ভাবনা নেই। যদি আগামী নির্বাচনে তিনি না ফেরেন তখন লোন শোধের কথা

ভাবলেই চলবে, ততদিন আয়টা একটু বাড়ুক। কিন্তু হায়রে! অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। পেট্রোলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি চড়ার লোক গেছে বাড়ন্ত হয়ে। অফিস টাইমে কিছু শেয়ারের খদ্দের জোটে, অন্য সময়ে প্রায় তীর্থক্ষেত্রের কাক অথবা ভিখিরিদের মত যাত্রীর আশায় বসে থাকতে হয়। কারণ আমাদের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়ার চেষ্টার ফলে সমাজের শ্রেণী বিভাগ ক্রমশ কমে আসছে। শ্রেণীহীন সমাজ হতে আর বেশী দেরী নেই, হারাধনের দশটি ছেলের ক্রমে ক্রমে হারিয়ে যাওয়ার মত শ্রেণীগুলিও লোপ পেতে পেতে এখন বলা যায় 'রইল বাকী দুই'। একটু খেয়াল করলেই সকলের মনে পড়বে, আগে সমাজের শ্রেণীর স্তর অনুসারে রেলগাড়ীতেও থাকতো বিভিন্ন ক্লাস—থার্ড ক্লাস, ইণ্টার ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, এরপরও স্পেশাল ফার্স্ট ক্লাস বা সেলুন। আজকাল মাত্র দুটি ক্লাস—ফার্স্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাস। অর্থাৎ শ্রেণীর স্তরগুলি এখন দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছে—উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত। মাঝে মধ্যে ট্যাক্সি চড়ে যারা একটু স্ফূর্তি করতো। সেই মধ্যবিত্তরা ঠিক মধ্যপদলোপী কর্মধারায়-এর মতই অস্তিত্ব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। যারা বীরভোগ্যা বসুন্ধরার নীতি অনুসারে ভাগ্যকে সাদা পথে অথবা কালো পথে জয় করতে পেরেছে তারা মিশে গেছে উচ্চবিত্তের দলে। বাকী সব নিম্নবিত্ত হয়ে যাচ্ছে, তাদের শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে, জগৎ সৃষ্টির সেই আদি যুগের 'struggle for existence' মন্ত্রটি বুকে রেখে, কালোবাজারী মুনাফাখোর, রাজনৈতিক নেতা-রূপ ডাইনোসেরাসদের বিরাট হাঁ-এর সামনে কোনরকমে টিঁকে থাকা মাত্র। ফলে উচ্চবিত্তরা গাড়ী হাঁকিয়ে চলে আর নিম্নবিত্তরা বাদুরঝোলা হয়ে বাসে চড়ে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ মত 'মরতে মরতে মরণটাকে' একেবারে শেষ করে এনেছে। কিন্তু ট্যাক্সি চড়ার মধ্যবিত্তরা মধ্যপথ ছেড়ে নিম্নদের সঙ্গে ক্রমশ এক হয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য সমাজে আর একটি শ্রেণী আছে, তারা নির্বাচনে জেতা 'জনগণ অধিনায়ক' শ্রেণী। এ'রা সরকারী খরচে বাতানুকূল সেলুন-কারে অথবা প্লেনে চলাফেরা করেন, স্বদেশ ঘুরে দেশবাসীর অবস্থা জানার সময় না হলেও ঘন ঘন বিদেশ সফরে যান। কিন্তু এই শ্রেণীটির কথা সমাজ ব্যবস্থার হিসাবের খাতায় পাওয়া যাবে না। ব্যবসায়ীদের ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার দু নম্বরী রসিদ বই-এর মত এ'রা সর্বদাই হিসাবের আড়ালে রয়ে যান। পাঁচ বছর গদিতে থাকতে পারলে এ'রা পাঁচ পুরুষের জন্য যা রসদ সংগ্রহ করে নিতে পারেন তাতে পরবর্তী নির্বাচনে গদি না টিকলেও ক্ষতি হয় না, অনায়াসে উচ্চবিত্তদের গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে যেতে পারেন।

বেচারা ঈশ্বরী পাটনীর দ্বিতীয় গাড়ী কেনার স্বপ্ন তাই স্বপ্নই হয়ে আছে। ট্যাক্সির খদ্দের আর হয় না। এমনি একদিন আশ্বিনের ভরা দুপুরে, তাল পাকা রোদের অসহনীয় ঝাঁঝে, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে গাড়ীতে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল ঈশ্বরী। চমক ভাঙ্গলো মধুর কণ্ঠের ডাকে—'এই ট্যাক্সি যায়েগা ? চোখ কচলে সে দ্যাখে, সামনে এক সুবেশা, সালঙ্কারা মহিলা—সাজের ও মেক-আপের বহরে বয়স অনুমান করা কঠিন। বাঙালী ঈশ্বরী সোজা হয়ে বসে নিজের মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে বললো—'জী মেমসাব।' অবশ্য এটাই আজকালকার রীতি হয়ে গেছে, চালক মাত্রেই যেন সকলে হিন্দীভাষী। কলকাতার ট্রামে বাসেও হামেশা শোনা যায়, 'রোককে, জেনানা হ্যায়।' ঈশ্বরী গাড়ীর পিছনের সিটের দরজা খুলে দিল। মহিলা গুছিয়েগাছিয়ে বসে বললেন, 'চল কুমারটুলি।' দীর্ঘ পথের যাত্রী—অনেকদিন বাদে এমন শাঁসালো খদ্দের পেয়ে ঈশ্বরীর মন চনমন করে উঠলো। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে সে মহিলার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। মহিলাকে দেখে সহজ সরলই মনে হচ্ছে।—'মেমসাহেব কী কলকাতাতেই থাকেন ?' ঈশ্বরী তাঁকে 'মেমসাহেব' বলেই সম্বোধন করা ঠিক মনে করলো। কারণ সে দেখেছে, আজকাল বড় বড় ঘরের

মহিলারা 'মা' বা 'মাসিমা' বলে ডাকার চেয়ে 'মেমসাহেব' বলাটা পছন্দ করে থাকেন। তাতে একটা status-এর ছাপ ফুটে ওঠে। মহিলা উত্তর দিলেন, 'না ভাইয়া, আমরা কাশীতে থাকি। বছরে এই সময়ে একবার বাপের বাড়ীতে আসি।' ঈশ্বরী বুঝতে পারলো প্রবাসী এই মহিলা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল নন। তাই এমন নির্ভয়ে একজন অপরিচিত ড্রাইভারের কাছে সত্যি কথাটা অনায়াসে বলে ফেললেন। সে শুভানুধ্যায়ীর মত মোলায়েম গলায় উপদেশ দিল--'মেমসাহেব, দিনকাল তো ভাল নয়। এভাবে একা একা চলাফেরা করা ঠিক নয়।' শুনে ভদ্রমহিলার মুখ মুহূর্তের জন্য একটু ফ্যাকাশে দেখালেও পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন, 'আমাকে একা একাই চলাফেরা করতে হয় ভাইয়া, আমার অভ্যেস আছে। স্বামী, ছেলে-মেয়েরা সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। কে কার সঙ্গে আসবে। তারা এলেও যার যার সুবিধে মত আসবে।'

তা আজকের এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে সবই তো 'একক', 'যৌথ' শব্দটাই বিলীন হয়ে যেতে বসেছে। আগেকার দিনে ছিল বড় বড় একান্নবর্তী পরিবার, কত দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে সকলে একসঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারতো। এখন সব পরিবারই একেকটি ছোট ছোট ফ্ল্যাটবাড়ীর একক ইউনিট—স্বামী স্ত্রী ও একটি বা দুটি ছোট ছেলেমেয়ে। সেখানে বৃদ্ধ মা বাবাও অবাঞ্ছিত তথা লাঞ্ছিত। আর ছেলেমেয়েরাও কিছুটা বড় হয়ে গেলেই সেই একক ইউনিটটিও ভেঙ্গে Cross puzzle খেলার চৌকো চৌকো খোপের মত একেকটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের খোপ তৈরী হয়ে যায়। ম্যাথু আর্নল্ড-এর সেই বিখ্যাত উক্তিটিই এখন সত্য হয়ে উঠেছে—জীবন সমুদ্রে আমরা মরণশীল মানুষগুলি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত একা বাস করি। আমাদের ব্যক্তিত্বের ঢেউগুলি সকলকে সকলের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। ঠিক যেমন আজকালকার বহুতলবিশিষ্ট বাড়ীগুলি—একই বাড়ীতে অতগুলি

পরিবার একসঙ্গে বাস করলেও কেউ কারো প্রতিবেশী হয়ে ওঠে না।

ঐক্য যে ভেঙ্গে ভেঙ্গে একক হয়ে যাচ্ছে তারই প্রতীক যেন এই মহিলাটি—নিঃসঙ্গ, একাকী। তাই অনেকদিন পরে দেশওয়ালী ভাই-এর মত ঈশ্বরীকে পেয়ে ও তার সহানুভূতিপূর্ণ কথা শুনে তিনি তাঁর মনের সব ভার উজার করে বলতে শুরু করলেন,—

"কি বলবো ভাইয়া, তুমি আমাকে একা চলতে নিষেধ করছো, আমার ঘরের লোক বলেন উল্টো কথা। একা চলবে নাতো কি? এই নারী-শাসিত সমাজে মহিলারা সঙ্গী নিয়ে চললে, সেটাই লজ্জার। (সেই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন মহিলা) আর ভাই, আমার স্বামীটি নামে পঞ্চানন, কাজেও তাই। পঞ্চমুখে পাঁচ দিক তাঁকে সামলাতে হয়। কত সমিতি ও সংঘের যে তিনি সভাপতি তার হিসেব নেই। তাঁর দু'জন প্রাইভেট সেক্রেটারী আছে। তারাও হিমসিম খেয়ে যায়। আমার বড় ছেলে গজানন, বলতে নেই বড় কৃতী ছেলে। বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট পাশ করে সেই যে ব্যবসায় ঢুকেছে তার আর কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই। জিনিষপত্রের দর যেমন হু হু করে বাড়ছে, ছেলের আমার আয় যেন তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চলেছে। ব্যবসা করার ঐতো সুবিধে—সারা দেশের লোক যত না খেয়ে মরবে ব্যবসায়ীর পকেট তত ভারী হবে। আমার ছোট ছেলে ময়ূরবাহন—সেও কম কর্তাব্যক্তি নয়। সে আবার আরচারী ক্লাবের মেম্বার কিনা, তারও সময় একেবারে নেই। এই তো সেদিন তাদের দল বিদেশে খেলতে গিয়েছিল। কিন্তু কি বলবো, ঐ বিদেশীগুলো এমন ধূর্ত, সবসময় কায়দা করে ভারতীয়দের দেয় হারিয়ে। তাই এবার ওরা বিদেশীদের হারাবে বলে প্রাণপণ লড়ছে। আর আমার দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ে কমলা তেমন লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাইনি বটে, কিন্তু গৃহকর্মে খুব সুনিপণা। কি করবো বল, আগে তো আমাদের দেশে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার নিয়ম ছিল না,

তারা ছিল সেবাদাসী---রাঁধ বাড়, সকলকে খাওয়াও, আর বছরে সন্তানের জননী হও। তা দুঃখের কথা কি আর বলি, মেয়েকে আমার জামাই-এর পছন্দ নয়, —সে পার্টিতে গিয়ে ইংরাজীতে কথা বলতে পারে না, মদ খেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে হুল্লোড় করতে পারে না। তাই তো ছোট মেয়েকে কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়ে একেবারে চৌকস তৈরী করেছি। আমার ছোট মেয়ে বাণী যা স্মার্ট না, সে যখন জিনস্ পরে নেচে নেচে ডিসকো দিওয়ানার গান গায়, তখন সকলে পাগল হয়ে যায়। এবার সে দশ / বারোটি ফাংশানে গান গাওয়ার কনট্রাক্ট পেয়েছে।"

কথা বলতে বলতে খেয়াল নেই, ট্যাক্সি এসে কুমারটুলিতে থামলো। মহিলা ট্যাক্সি থেকে নেমে মিটার দেখে, ব্যাগ খুলে ভাড়ার টাকা বের করে ঈশ্বরীর হাতে দিলেন। তারপর যেই পেছন ফিরে পা বাড়িয়েছেন, ঈশ্বরী খপ করে তাঁর হাত চেপে ধরে গায়ের গুরু পাঞ্জাবীর তলা থেকে একটা ভোজালি বের করে তাঁর বুকের কাছে ধরে বললো—"মেমসাহেব, গত জন্মে যখন দেবীকে আমার নৌকোয় করে পার করেছিলাম, তখন তাঁর পাদস্পর্শে আমার নৌকোর পাটাতন সোনা হয়ে গিয়েছিল। এ যুগের দেবীরা তো সে অলৌকিক ক্ষমতা হারিয়েছেন, তাই অন্ততঃ গায়ের ঐ অলংকার ক'টা খুলে দিয়ে যাও। নইলে এই দেখেছো তো এটা কী। এ জন্মে আমি নৌকো পারাপার করিনে বটে, কিন্তু ইলেকসনের কাজ করার সময় ভবসাগর পার করানর বিদ্যে কিছুটা আয়ত্ব করেছি। টুঁ শব্দটি না করে ভালোয় ভালোয় সব খুলে দাও।"

মহিলা নিঃশব্দেই এক এক করে গয়নাগুলি খুললেন, তারপর কাঁদ কাঁদ মুখে ঈশ্বরীর হাতে তুলে দিয়ে, ছুটে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

মহিলা শাসিত সমাজের মহিলারা আজকাল আর অত বোকা

নয়। গয়নাগুলো সবই ইউনিকের গিল্টী করা। তিন হাজার টাকা ভড়ি সোনার গয়না আর আজকাল ক'জন পরে।

অন্নদামঙ্গলের এই নব সংস্করণ
কলিযুগ অনুসারে এ পরিবর্তন।
রায় গুণাকর ভারতের বন্দিয়া চরণ
অন্নদামঙ্গলের কথা করি সমাপন॥



"অচিরেই আপনি দলের প্রথম সারির নেতা"

অভিনেতা নেতা দেবতা সমীকরণ

দেখুন ভাই, আমি বিজ্ঞানী নই, তাত্ত্বিকও নই। তবু দৈবগুণেই সম্ভবতঃ, আমি সমাজ বিজ্ঞানের এক দশ-সূত্রী তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছি। এই তত্ত্বটাতেও অনেকটা আপানের সেই 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি'র মতো সম্পর্ক ও কার্যকারণ সূত্র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বাস করুন, একটুও নকল বা চুরি করিনি। গোপনে গোপনে দালালি দিয়ে বিদেশ থেকে আমদানিও করিনি। একেবারে নিজের মাথা থেকেই আবিষ্কার করেছি। তবে যদি কোথাও অনুকরণের ছাপ রয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে তা যুগোপযোগী দু'নম্বরী কারবারের প্রভাব বলে দয়া করে মেনে নেবেন।

এই তত্ত্বে আমি ভারতীয় সমাজের তিনটি সমতুল্য বিষয়ের একটা অভূতপূর্ব সমীকরণ করার চেষ্টা করেছি। বিষয় তিনটি হলো, (ক) অভিনেতা তথা চলচ্চিত্র, (খ) নেতা তথা রাজনীতি এবং (গ) দেবতা তথা সর্বজনীন পুজো। জানি আপনারা আঁতকে উঠে বললেন, 'কী আশ্চর্য। এদের আবার সমীকরণ হয় নাকি?' তাছাড়া দেবতা ও ধর্মকর্ম নিয়ে কটাক্ষ করা মহা অন্যায়, ঘোর অনাচার। এই ভারতের গঙ্গাতীরে কিনা ধর্মের অবমাননা, এ সহ্য করা হবে না। দাঁড়ান, দাঁড়ান। আগেই ক্ষেপে উঠে যেন দাঙ্গা শুরু করে দেবেন না। ধর্মে অবমাননা করবো এমন বুকের পাটা আমার নেই। আমিও প্রতি বছর ৺দুর্গা ও অন্যান্য পুজোর চাঁদা নিই, অষ্টমী পুজোর দিন টাকা দশেকের সন্দেশ কিনে প্যাকেটের উপর নাম গোত্র লিখে পুজো দেবার জন্য মণ্ডপে দিয়ে আসি, প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ধাক্কাধাক্কি করে, ভুল মন্ত্র উচ্চারণ করে অঞ্জলিও দিই, রাস্তায় চলতে চলতে শনির থান বা মন্দির দেখলেই হাত তুলে মাথায় ঠেকাই, কখনো দশ পয়সা, কখনো

বিশ পয়সা ছঁুড়ে দিই। আমি কেন ধর্ম নিয়ে তামাসা করতে যাবো, বলুন তো? ওতে যে নিজের মুখেই থু থু ছিটানো হবে। গত পুজোয় ঐ অঞ্জলি দেবার সময়ই তো হঠাৎ এই তত্ত্বটা আমার মাথায় এসে গেল। ৺মায়ের কি অসীম দয়া। আমাদের মন্ত্রীপ্রবররা পর্যন্ত ভোটের আগে আদ্যাশক্তি পীঠে বসে যজ্ঞ করেন, হয়তো বা মাদুলি কবচও ধারণ করেন, দেবতাকে নিয়ে আমরা কখনো ছেলেখেলা করতে পারি? আমি কি জানি না যে ঐ পাথরের দেবতারা কত জাগ্রত?

কিন্তু দেবতার কোপের আগেই আপনারা যেন দয়া করে আমার ঘাড়ে কোপ বসিয়ে দেবেন না। আপনারা যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের হাতিয়ার হিসেবে আগেই মেজাজটা চড়া করে তোলেন, এতে কী লাভ হয়, বলুন? আপনার ঐ এক চিল্লতে মাছের টুকরো দিয়ে এক থালা ভাত খাওয়া টিঙটিঙে ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি লম্বা শরীরটাকে তো যে কোন ভিন প্রদেশী একজন একটু ধাক্কা দিলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন। আর পড়ছেনও নাকি? সব জায়গা থেকে গঁুতো খেয়ে এখন তো নিজের দেশেও প্রায় বিদেশী হয়ে আসছেন। এরপর 'আ মরি বাংলা ভাষা' আবার না বিদেশী ভাষা হয়ে যায়, তাই তো ভয়ে ভয়ে আছি। তা হবে না কেন? আঁতেলেকচুয়া-লিজম্ ও কৃষ্টির গর্বে আপনারা তো অ-বঙ্গের মাটিকে প্রায় সরা মনে করতেন। কিন্তু পেশীর গঁুতোয় আপনাদের মস্তিষ্কও যে থেঁতলে গেছে। ফলে সেই তাসের দেশের কৃষ্টি এখন এসে ঠেকেছে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা পাড়ায় পাড়ায় নাটকের দল সৃষ্টিতে। কারণ সংস্কৃতির অন্যান্য বিদ্যেগুলো আয়ত্ত করতে যে দীর্ঘ সময়, সাধনা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন, আপনাদের সে সময় বা ধৈর্য নেই। সুতরাং আজকের এই গতিশীল দুনিয়ায় অল্প খরচে ফাস্ট ফুডের মতো স্বল্প প্রতিভায় ফাস্ট লাইমলাইটে আসার অন্যতম পন্থা অভিনয়। কণ্ঠ না থাক, রূপ না থাক, উচ্চারণ না হোক, কুছ পরোয়া নেহি। মেকাপ নিয়ে, গলা কাঁপিয়ে, অঙ্গভঙ্গি করে কথা

বললেই নাটক হয়ে গেল। দর্শক ও শ্রোতারা কত বড় সমঝদার তা তো জানা আছে। আর হাততালি, হৈহৈ, কাগজে ছবি, সমালোচনা, প্রশংসা ইত্যাদির জন্য আগে থেকে কয়েকখানা সৌজন্যমূলক আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে ব্যবস্থা করে রাখলেই গুরুজি কি ফতে। ঐ ফাস্ট ফুড খানেওয়ালা দর্শক ও শ্রোতারাও ফাস্ট ফুড মার্কা কৃষ্টির ভক্ত আজকাল. গুরুপাক খাবার ও গুরুগম্ভীর শিল্প সংস্কৃতির কোনোটাই হজম হয় না তাদের। ঐ সব পাড়ার ফাস্ট অভিনেতাদের কিছুদিন স্টুডিও পাড়ায় ঘোরাঘুরি করার পর হঠাৎ একদিন হিরো বনে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। এরপরই তাদের দেখা যায় বোম্বাই-এর বড় পর্দায় ভিলেনের সঙ্গে "ঢিসুম" "ঢুসুম" শব্দে প্রচণ্ড ফাইট করতে। এমনি করেই তো আমাদের পাড়ার পটলা দিব্যি অমুক কুমার হয়ে গেছে—রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীর দেওয়ালে তার ছবির পোস্টার।

জনপ্রিয়তা অর্জনের সবচেয়ে সহজতম পথ এখন দুটি—অভিনেতা বা রাজনৈতিক নেতা হওয়া। একবার যদি এর একটি হতে পারেন তবে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র-পত্রিকা, আকাশবাণী, দূরদর্শন, বড় বড় বিজ্ঞাপনদাতা সব আপনার পেছনে ধেয়ে আসবে। আজ্ঞে না,—এর জন্য আপনাকে কোনো জ্ঞান অর্জন করতে হবে না, সাধনা করতে হবে না বা কোনো কষ্ট করতে হবে না। কলেজে পড়ার সময় অধ্যক্ষকে ঘেরাও করে, অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করুন, শার্টের কলার চেপে ধরে দুই একটা চড়-চাপড় লাগান। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আপনি ছাত্রনেতা হয়ে গেলেন। আর যদি কয়েকটা বোমা পটকা ছোঁড়ার জন্য পুলিস আপনাকে দু'একদিন হাজতবাস করায় তবে তো কথাই নেই, অচিরেই আপনি দলের প্রথম সারির নেতা। পরের বারের নির্বাচনে টিকিট পেতে আপনাকে আর বেগ পেতে হবে না। তবুও যদি আপনার দলের সভাপতি বা সম্পাদক একটু ট্যাঁ-ফুঁ করার চেষ্টা করেন, তবে আপনি আপনার লিকলিকে হাতটা মুঠো করে, বাহুর গুলিটা ফোলাবার চেষ্টা করে ওঁদের নাকের সামনে

এগিয়ে দেবেন, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। ও'রা টিকিট না দিয়ে যাবেন কোথায়? ঐ বুড়ো-হাবড়া, গদি আঁকড়ে থাকা দলপতিদের আসল খুঁটি তো ভাই সেই আপনাঁরাই! এরপর আর ভাবতে হবে না—মনোনয়ন, প্রচার, দেওয়াল লিখন, ফেস্টুন, পতাকার মালায় আকাশ ঢেকে দেওয়া সব কিছুর দায় দলের। আপনি শুধু আপনার সাকরেদদের নিয়ে ভোটের আগে ক'দিন ভোটারদের বাড়ী ঘুরে হাত জোড় করে দেশ সেবার মৌখিক প্রতিশ্রুতিটুকু উচ্চারণ করে আসবেন। মিথ্যা বলছেন বলে একটুও ঘাবড়াবেন না। আমাদের সংবিধানের ১৯তম অনুচ্ছেদে যে বাক্-স্বাধীনতা অর্পণ করা হয়েছে সেখানে 'মিথ্যা কথা বলিও না' বলে কোনো নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়নি। মিথ্যা কথাও 'স্পিচ' এবং ঐ 'স্পিচ' আপনার সাংবিধানিক অধিকার। সুতরাং এবার বিধানসভায় পৌঁছে আপনি পাঁচ বছর এই 'স্পিচ' দেওয়াটা একটু ভালো করে রপ্ত করে নিন। পরের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের টিকিট পেতে আর আপনার কোন অসুবিধা হবে না। ভাবছেন নকল করে পাস করেছেন, বক্তৃতা লিখবেন কী করে? না, না, তার জন্য কোনো ভয় নেই। কত বি. এ., এম. এ. পাস বেকার ছেলে রাস্তায় ঘুরছে—ঐ যে কাঁধে একটা রঙিন কাপড়ের ঝোলা নিয়ে আধুনিক কবিতার মিনি পত্রিকা সম্পাদনা করে আর ঘুরে ঘুরে ফিরি করে, ওদের কাউকে ডেকে নিন না। আপনার কাছে আসতে পারলে ধন্য হয়ে যাবে। লেখা-টেখার অভ্যেস আছে, ভালোই লিখে দেবে বক্তৃতা। তাছাড়া বক্তৃতায় আবার ভালো কথার কি দরকার আছে, ভাই? শুধু অপর পক্ষের কুৎসা ও নিন্দা করে 'স্পিচ' দেওয়াই তো এখনকার নেতাদের একমাত্র অস্ত্র। অবশ্য যদি কোনো পণ্ডিতমহলে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেবার প্রয়োজন হয়, তাহলেও আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি হুকুম করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় সব বাঘা অধ্যাপকরাও পরম আগ্রহে আপনাব ভাষণ লিখে দেবেন। কেন দেবেন না, বলুন? ও'দের প্রমোশন, রিডার,

প্রফেসর, ভাইস-চ্যান্সেলর প্রভৃতি পদগুলো যে তখন আপনার হাতেই নির্ভর করছে। আপনার ডিগ্রী না থাক, শক্তি আছে তো। ডিগ্রীই কি সব?

এই দেখুন, এতক্ষণ বক্‌বক্‌ করে আমার আসল তত্ত্বটাই এখনো বলা হয়নি। 'বুকনি' ঝাড়া যে আমাদের প্রাদেশিক কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ, আমি তার ব্যতিক্রম হই কেমন করে? তাছাড়া সেই যে 'কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে' বলে ছোট বয়সে একটা কবিতা পড়েছিলাম, ওটা নাকি বৃটিশ আমলের নীতি বলে বাতিল করা হয়েছে। এখন ভাই, কাজ করলে সকলে ব্যঙ্গ করে বলে উপরওয়ালার চামচে। আপনারাও নিশ্চয়ই এখন অফিসের ক্যান্টিনে বসে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন আর রাজা উজির মারছেন। তা একটু সময় দিয়ে দয়া করে আমার এই তত্ত্বটা একটু পড়ুন, ভাই। মাত্র দশটা সূত্র—বিশটা নয়।

সমীকরণ তত্ত্ব :

প্রথম সূত্র : ভারত নামক এই উপমহাদেশে অভিনেতা, নেতা এবং দেবতা (মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর) এই তিন পদবাচ্য প্রাণী সর্বাধিক জনপ্রিয় ও মাননীয়। এই তিন 'তা' বিশিষ্ট প্রাণীদের এখানকার জনগণ অণ্ডে 'তা' দিবার ন্যায় উষ্ণ আদর ও আপ্যায়নে ভরিয়া রাখে। তবে পেটের তলায় নয়, মাথায় করিয়া রাখে।

দ্বিতীয় সূত্র : অভিনেতা, নেতা ও দেবতাদের জনগণ মঞ্চে স্থাপন করিয়া সার্বজনীন প্রথায় আরাধনা করিয়া থাকে। ইঁহাদের জন্য যে মণ্ডসজ্জা, তোরণ, কেতনদণ্ড প্রভৃতি নির্মাণ করা হয় তাহা ভারতের কলাকৃতির প্রকৃষ্টতম নিদর্শন হইয়া উঠে।

তৃতীয় সূত্র : অভিনেতা, নেতা ও দেবতাদের লইয়া এই সার্বজনীন অর্চনার ব্যবস্থা সমাধা হয় জনগণের চাঁদার অর্থে। এই দেশ অতি দরিদ্র বলিয়া পরিচিত হইলেও ইঁহাদের আরাধনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে কোনো অসুবিধা হয় না। জনসাধারণের জীবনযাত্রা চরম কষ্টসাধ্য হইলেও, তাহা ভাগ্য বলিয়া মানিয়া

লইয়া, জনগণ উচ্চগ্রামে এই তিন পদধারীদের জয়গান করিয়া থাকে। যেমন অমুক জি কি জয়, অমুক জি জিন্দাবাদ, অমুক নাথ কি জয় ইত্যাদি।

চতুর্থ সূত্র : অভিনেতা, নেতা ও দেবতা নামক তিন প্রাণীদেরই বিপুল সংখ্যক ভক্ত থাকে। এই ভক্তকুলে হাজার হাজার নারী পুরুষ শিশু তরুণ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের একইরকম ভাবাবেগে উন্মত্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। ভক্ত দর্শনার্থীগণ ইঁহাদের এক পলক দর্শনের জন্য পথিপার্শ্বে, মাঠে ময়দানে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে কষ্টবোধ করে না। ঝড়জল বা তীব্র রোদ ইহাদের আগ্রহকে কাবু করিতে পারে না।

পঞ্চম সূত্র : অভিনেতা, নেতা ও দেবতাদের সাজসজ্জা ও মেকাপের উপর তাহাদের খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা, অর্থাৎ যাহাকে গ্ল্যামার বা ক্যারিস্মা বলা হয়, নির্ভর করে। এজন্য ইঁহারা সর্বদা পরিবেশ, স্থান ও অনুষ্ঠান অনুসারে বেশ ধারণ করেন। এই তিন প্রাণীই বহুরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হ'ন বার বার।

ষষ্ঠ সূত্র : অভিনেতা, নেতা ও দেবতা এই তিন পরম শক্তিমান প্রাণীই শত্রু দমনে সিদ্ধহস্ত। দেবতা দমন করেন অসুর, নেতা দমন করেন বিরোধীপক্ষ এবং অভিনেতা দমন করেন ভিলেন। ইঁহারা কেউ কখনো পরাজিত হন না—সর্বদা অজেয় থেকে যান।

সপ্তম সূত্র : অভিনেতাদের ক্ষেত্রে 'ডামি' শব্দটির কথা কাহারও অজানা নয়। যদিও নেতা ও দেবতাদের ক্ষেত্রে 'ডামি' শব্দটির প্রচলন নাই, কিন্তু তাঁহাদেরও দুরূহ কাজকর্মগুলি ডামির ন্যায় সম্পন্ন করেন যথাক্রমে মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব এবং দেবতার পাণ্ডা বা পুরোহিত।

অষ্টম সূত্র : অভিনেতা, নেতা ও দেবতাদের কাছে আমরা সর্বদা 'দেহি দেহি দেহি' করিয়া বর যাচ্ঞা করিয়া থাকি—রূপ, যশ, ধন, দৌলত, অর্থ, চাকুরি হইতে অটোগ্রাফ পর্যন্ত। ইঁহারা নীরবে

বিশেষ বিশেষ ভক্তকে কেবল বর দান করিয়া ধন্য করেন। সব ভক্ত তাঁহাদের নিকটে পেঁছাইতে সমর্থ হয় না।

নবম সূত্র: অভিনেতা, নেতা ও দেবতা এই তিন প্রাণীকেই আমরা অতি জাগতিক, অতি মানবিক বা সুপার হিউম্যান বলিয়া ভাবিয়া থাকি। এজন্য তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রাত্যহিক কাজকর্মগুলিও আমাদের কাছে রহস্যময় ও কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠে। ফলে ইঁহাদের খাদ্য, পোশাক, সখ সৌখিনতা, প্রেম, ভালবাসা, লীলাখেলা প্রভৃতি হইয়া শুধু যে মহাকাব্য রচিত হয় তাহাই নহে—আকাশবাণী ও দূরদর্শনের মাধ্যমে তাহাদের জীবন-চিত্র অডিও ভিসুয়াল প্রদর্শনের দ্বারা জনগণের চিত্তবিনোদন করা হয়। সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন প্রভৃতি মাস-মিডিয়াকে এই তিন প্রাণী একচ্ছত্রভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে।

দশম সূত্র: অভিনেতা, নেতা ও দেবতাগণ চির অমর। দেবতারা হাজার হাজার বছর আগে মর্ত্যলোক ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও মূর্তির মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার দ্বারা আজও জীবন্ত হইয়া উঠেন। নেতাগণ মৃত্যুর পর মূর্তি, রাস্তা, স্টেডিয়াম, ময়দান, সরোবর প্রভৃতি নামের মধ্যে সদা জাগ্রত হইয়া থাকেন। আর অভিনেতাগণ তো ফিল্মের সেলুলয়েডে প্রায় সজীব সচল হইয়া বিরাজ করেন। আজকাল অবশ্য নেতাদের ক্ষেত্রেও ভিডিও এবং ফিল্মের সাহায্যে তাহাদের জীবন্ত করিয়া রাখার প্রয়াস তীব্র হইয়াছে।

সিদ্ধান্ত: অভিনেতা হইতে নেতা এবং নেতা হইতে দেবতায় উত্তরণকেই পৌরাণিক কাহিনীতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে 'দিবি আরোহণ' বলিয়া, যাহার অর্থ স্বর্গে বা দৈবত্বে আরোহণ। যেমন শ্রীকৃষ্ণ প্রথম জীবনে অভিনেতাদের ন্যায় প্রণয় ও লীলাখেলা করিয়া জনচিত্ত মোহিত করিয়াছিলেন। মধ্য জীবনে নেতা হইয়া তিনি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, যাহা মহাভারত নামক মহা-কাব্যের উপজীব্য হইয়া উঠে। শেষ জীবনে তাই তিনি দেবতা

হইয়া পূজিত হইতে শুরু করেন এবং মন্দিরে মন্দিরে (কারণ সেকালে পাকা রাস্তা বা স্টেডিয়াম সম্ভবত ছিল না) মূর্তি রূপে স্থাপিত হন। সুতরাং আমি এই তত্ত্বে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে আজও আমাদের সনাতন ধর্মের ঐ 'দিবি আরোহণের' আদর্শ উজ্জ্বল হইয়া মানব জীবনে অনুপ্রেরণা যোগাইতেছে। প্রথমে অভিনেতা রূপে জীবন শুরু করিয়া ক্রমশ নেতা এবং সর্বশেষ দেবতায় উত্তরণ তাই আজ বহু মানবের জীবনের লক্ষ্য। এই শ্রীকৃষ্ণ-আদর্শ আজ ভারত হইতে আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

* * *

এই আমার দশ-সূত্রী তত্ত্ব, ভাই। যদি ভালো লেগে থাকে, তবে দোহাই আপনাদের, আমার নামটা যেন কখনই নোবেল পুরস্কারের জন্য অনুমোদন করে পাঠাবেন না। তার চেয়ে যদি দিল্লীর দরবারে আপনার খুঁটির জোর থাকে তবে দিন না দয়া করে কোনো একটা 'শ্রী' বা 'ভূষণ' পাওয়ার ব্যবস্থা করে। ও'রা যদি এই দল-ছাড়া লোকটাকে 'পদ্ম' দিতে রাজী না হন তবে আমাকে একটা পদ্মের 'বোঁটা' দিলেও চলবে। আমি ঐ 'বোঁটাশ্রী' মেডেলটাই বুকে ঝুলিয়ে বন্ধু মহলে জাঁক দেখিয়ে বলবো— 'আজ্ঞে না, এটাকে বলে 'মৃণালশ্রী', মৃণাল না থাকলে কি পদ্ম দাঁড়াতে পারে বা জলের ওপর অমন সুন্দর হয়ে ফুটে থাকতে পারে?'



শিউপূজন দাসের নাতি নাতনীরা হল্লোড় করে বেড়াচ্ছে

নবজ্যোতির বঙ্গদর্শন

"রিলিজিয়ান ইজ ওপিয়াম" এই পরদেশী পরগাছা স্বদেশে রোপণ করার পাপে নবজ্যোতির আত্মার মুক্তি ঘটেনি। প্রারব্ধ ফল ভোগ করার জন্য কয়েক দশক পরে নবজ্যোতিকে তাই আবার জন্ম নিতে হল এই ভারতবর্ষেই। গত জন্মে নবজ্যোতি ও তার দলের লোকেরা ধর্ম, পাপ, পুণ্য, জন্মান্তর, পূর্বজন্মের সংস্কার, প্রারব্ধ কর্মফল প্রভৃতি বস্তা পচা সনাতন তত্ত্বগুলিকে বুজরুকি বলে মনে করতেন এবং সেগুলিকে ভারতের সমাজ থেকে সমূলে উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন নবজ্যোতি ও তার দলের ক্যাডাররা উপলব্ধি করতে পারেননি যে একদা উত্তরপ্রদেশবাসী সীয়াবর রামচন্দ্রজী ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণে যে জয়যাত্রা করেছিলেন সেই ধর্ম-সাম্রাজ্যবাদের শিকড় উপড়ে ফেলতে তাদের লেনিন ও স্ট্যালিনকে আরও কয়েক জন্মের সাধনার দ্বারা পাশুপত অস্ত্র অর্জন করতে হ'তো। অন্ততঃ সাম্প্রতিককালের টি ভি সিরিয়াল রামায়ণ ও মহাভারতের জনপ্রিয়তা দেখলে বুদ্ধিমান কার্ল মার্কস নিশ্চয়ই তার ভাষা পাল্টে লিখতেন, —"ওয়ার্কারস অব দা ওয়ার্ল্ড ফলো ইন্ডিয়ানস।" মার্কস তো আর পবননন্দন হনুমন্তের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, থাকলে দেখতেন রামচন্দ্রের ওয়ার্কাররা কিভাবে প্রভুকে বুকের মধ্যে স্থান দেয়। 'সীয়ারাম' বা 'রাধেশ্যাম' মন্ত্রশক্তিতে যে কোন ইজমকে ভারতবাসী রুখে দিতে পারে। তাই তো এদেশে চরম কলুষিতা হলেও গঙ্গাজী পরম পবিত্রা, পতিত-পাবনী। সারা ভারতের লোক প্রতিদিন 'গঙ্গা মাঈকে' বুকে যে দুই নয়া, পাঁচ নয়া বা সিকিটা, আধুলিটা ছুঁড়ে দেয় তা ছেঁকে তুললে সম্ভবতঃ বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মত হাজারটা শিল্প প্রজেক্ট তৈরী হয়ে যেতে পারে। এদেশের এমনই ধর্ম মাহাত্ম্য যে খাদ্যে বিষ, নকল ওষুধ বা শিশু খাদ্যে ভেজাল মিশিয়েও যদি

তীর্থক্ষেত্রে 'স্বর্ণধাম', 'গীতা মন্দির', 'পরমার্থ নিকেতন' প্রভৃতি ধরমশালা বা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া যায় তবে মোক্ষ লাভের পথে আর কোন বাধা থাকে না। সেইজন্যই তো ইহলোক এবং পরলোক দুটিই এই সমস্ত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও কারখানা মালিকদের নিয়ন্ত্রণে। এই সনাতন ধর্মের দেশে কিনা নবজ্যোতির রাজ্যের মাছাহারী নাস্তিকরা "দেওতা কো ভী খুন মাস চড়াতা হ্যায়।" সেইজন্যই তো এদের কালী মাঈকী জিভ খুনের লালচমে সর্বদা লক্‌লক্‌ করে ঝুলছে। সুতরাং তাদের নেতার কি করে মোক্ষ লাভ সম্ভব? তাই তো তাকে আবার এই মায়ার সংসারে ফিরে আসতে হ'ল।

নবজন্মের পর একবার পূর্বজন্মের জন্মস্থান বঙ্গ রাজ্যটি দর্শন করার সাধ হল নবজ্যোতির। যদিও নবজ্যোতির মধ্যে কোন প্রাদেশিকতাবাদ বা আঞ্চলিকতাবাদ গত জন্মেও ছিল না। সে সব সময় বলতো "বাঙ্গালী বাঙ্গালী আবার কি?" তাই তার প্রাক-জন্মের ছেলেকে বাঙ্গালীত্ব ত্যাগ করিয়ে সে একেবারে পশ্চিম ভারতীয় শিল্পপতি করে তুলতে চেয়েছিল। পাঁতি বাঙ্গালীগুলো যদি মাছের ঝোল আর ভাতের মায়া ত্যাগ করে ইডলি দোসা, চানা বতুরা, রোটি জল মাখানি খেতে শেখে তবেই না জাতীয় সংহতি গড়ে উঠবে। গত জন্মে জাতীয় সংহতির জন্য যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল তা কতটা সফল হয়েছে দেখার জন্য নবজ্যোতি তাই বঙ্গ রাজ্যের উদ্দেশে রওনা হ'ল। কিন্তু হায়! কোথায় সেই বঙ্গদেশ, যে দেশেতে চলতে গেলে দলতে হ'তো দূর্বাদল? এই ভারতের মহামানবের সাগরে কবে যে সেই রাজ্য ও তার অধিবাসীরা বিলীন হয়ে গেছে কেউ তা জানে না। নবজ্যোতির প্রাক্‌ জীবদ্দশাতেই সেই দেশ পূর্ব ও পশ্চিমে ভাগ হয়েছিল এবং অলিখিতভাবে উত্তর ও দক্ষিণ নামেও দুটি ভাগ ছিল। কিন্তু এখন তাও নেই। এখন হিমালয় সংলগ্ন উত্তরে গোর্খাখণ্ড, এরপর উত্তরাখণ্ড, গঙ্গার তীরবর্তী রসুল-ই-বরকতিস্থান এবং পূর্বে ঝোপ ঝাড়খণ্ড।

বঙ্গবাসী শান্তিনিকেতন নামে যে জায়গাটিতে একমাত্র মূলধন করে রেখেছিল তাও এখন পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে 'ইন্দিরা নিকেতন' নামে পরিচিত। সেখানকার রবীন্দ্ররজী, যিনি শর্মিলা ঠাকুরজী কী চাচা ছিলেন, তিনি অনেক দোহা লিখেছিলেন বটে, তবে সেগুলি বেদ উপনিষদের অনুবাদ ছিল বলে প্রমাণিত হওয়ায় সেই আমলেই পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। নবজ্যোতি অনেক কষ্টে 'কলিকাতা' নামে শহরটিকে খুঁজে পেলেও তা তার স্বদেশ বলে আর চিনতে পারলো না। তার পূর্বজন্মের শ্বশুরের দেওয়া হিন্দুস্থান রোডের তিনতলা বাড়িটি খুঁজতে গিয়ে সে এসে দাঁড়াল এক বহুতল গৃহের সামনে, যার নাম 'প্রপঞ্চধাম।' বাড়ীর মালিক ভজন দাস শিউপূজন আগ্রাসীওয়ালা। তার কাছে বাড়ীর ইতিহাস শুনে নবজ্যোতি গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এখানে পুরনো যে বাড়ীটা ছিল সেটা বছর তিরিশেক আগে উত্তরাধিকারসূত্রে তার পূর্বজন্মের ছেলের কাছ থেকে পায় তার দুই নাতনী। দুই নাত-জামাই বাড়ীর অংশ নিয়ে মামলা শুরু করে দেয়। বিশ বছর ধরে সেই মামলা নীচু আদালত থেকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আইনের ধারায় বিচরণ করেও আইনের জালের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। এদিকে একতলার ও দোতলার ভাড়াটে উচ্ছেদ করাও সম্ভব হ'ল না। কারণ সেই নাস্তিক নবজ্যোতি ও তার দলের লোকেরা বাড়ীওয়ালা মানেই 'হ্যাবস্' মনে করতেন, তা সে বাড়ী কোন বিধবার একমাত্র আয়ের উৎসই হোক অথবা কোন অবসর প্রাপ্ত কেরানীর বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থে বানান একমাত্র আশ্রয় হোক। তাই তারা সমস্ত আইন ভাড়াটে বা 'হ্যাবনটস্'-দের অনুকূলে তৈরী করেন। ফলে কলকাতার পুরনো বাড়ীগুলিতে ঝুনঝুনওয়ালা, গিডওয়ানী, সিংহানীয়া, অগ্রবাল প্রভৃতি যে 'হ্যাবনটস্' ভাড়াটেরা ছিলেন তারা বাঁদরের পিঠে ভাগ করার পদ্ধতিতে সব বাড়ীই গলাধঃকরণ করে নেন এবং সেগুলি পরে ভেঙে ফেলে বহুতল বাড়ী বানান। সেই বাড়ীর একেকটি

'ফ্যালাটি' থেকে ঈশ্বর কী কৃপা সে যে নাফা হ'লো তাতে কাশী, হরদোয়ার বা ঋষিকেশে অমন দশটা আশ্রম চালালেও পয়সা কভী খতম্ হবে না। কিন্তু ঐ ফ্ল্যাটগুলির কোনটিতেই কোন বঙ্গ সন্তানকে নবজ্যোতি দেখতে পেলো না। কারণ 'পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক' এই শ্লোগান দিতে দিতে তারা বহুকাল আগেই গলায় রক্ত উঠে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সময় প্রখর রৌদ্রে এস্প্ল্যানেড ইস্টের গলা পিচের রাস্তায় মিছিল নিয়ে ওরা যখন চিৎকার করে শ্লোগান দিত তখন উপরে অথর্ব-লোকের ঠাণ্ডা ঘরে বসে শিরি রামচন্দ্রজী ঠোঁটের কোণে চাপা হাসি মাখিয়ে বলতেন, 'হায় নবজ্যোতি! মজাইলি এ বঙ্গভূমি, মজিলি আপনি।'

বিষণ্ণ নবজ্যোতি জন্মান্তরের অভ্যাস-মত একটা লুঙ্গি ও বোতাম খোলা হাওয়াই শার্ট গায়ে চাপিয়ে একবার বাজারগুলো ঘুরে দেখতে গেল। কিন্তু সে বাজারও আর আগের বাজার নেই। কলকাতার দক্ষিণের বাজারগুলোতে শুধু থেঙ্গা (নারকোল), চিন্তপন্তু (তেঁতুল) আর রাশি রাশি কারিপাতা—সেই মোচা, থোর, পুঁই ডাটা, চাল কুমড়োরা যেন হাওয়ায় উবে গেছে। বাজার সংলগ্ন এলাকায় গড়ে উঠেছে দত্তাত্রেয় সঙ্ঘম্, উদয়াচলম্ নৃত্য মণ্ডলম্। সেখানে সিংহলাম্মা নায়ার, মীনাক্ষী সুব্রহ্মন্যরা ভারত-নাট্যম্, কুচীপুরী ও কথাকলি নৃত্যের আসর জমিয়ে বসে আছেন। পাশের খাবারের দোকানগুলো থেকেও গন্ধ আসছে দোসা, ইডলি, উত্তপোমা ও সম্বরের। নবজ্যোতির মনে পড়ল, গত জন্মে তিনি যখন দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন তখন প্রায় পনের দিন তিনি শুধু ভাত ছাড়া আর কিছু খেতে পারেননি। খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন যে রামচন্দরজী লঙ্কা পর্যন্ত ধর্ম সাম্রাজ্য বিস্তার করলেও উত্তর ভারতের কোন খাদ্য কিন্তু দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি এবং ভাষা তো প্রায় অস্পৃশ্য বলে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তুলসী দাসজী কী রামচরিতমানসকে দূরদর্শনের পর্দার মাধ্যমে আবার একবার দক্ষিণ ভারত জয়

করানোর চেষ্টা করা হয়েছিলো।

ভাবতে ভাবতে নবজ্যোতি সোজা চলে এল ভবানীপুরের দিকে। ভবানীপুরের বিখ্যাত যদুবাবুর বাজারের চেহারাও পাল্টে গেছে। বাজারে ঝুড়ি ভর্তি টিণ্ডা, কচেচ ছোলে, বরবটি, চিকু, সেঁও। আগে বাজারে গেলে ডাক শোনা যেত—'এই যে দাদা এদিকে, জ্যান্ত পোনা, ভেটকি, গলদা, বাগদা, আসুন।' কিন্তু এখন সেখানে রাস্তা চেপে বসা ঝুড়ি, বস্তার ফাঁক দিয়ে ঠেলাঠেলি করে ঘুরে ঘুরে বাজার করছেন সব পৃথুলা মহিলারা এবং দোকানদার হাঁকছে, 'আইয়ে আইয়ে ভাবীজী, বেনারস কী আম, হিমাচল কী সরবতি, একদম তাজা।' আরো বঙ্গদেশের রসগুল্লা ও সন্দেশের খ্যাতি ছড়িয়ে গেছিল সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও। আজকাল সে সব মিষ্টির দোকান আর নেই। এখন সেখানে আজমেরী নিমকিখানা, বিকানেরী ভুজিয়াবালাদের দোকানে পেঠা, কাজু ও পিস্তা বরফি, বেসন কী লাড্ডু, খোয়ে কী পেঁড়া আসর মাত্ করে দিচ্ছে। হায়, নবজ্যোতি একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সেই জন্মান্তরের রুই মাছের কালিয়া, ভেটকির দই-মাছ, ভাপা ইলিশ, চিংড়ীর মালইকারি এবং রাজভোগ, কাঁচাগোল্লা, প্রাণহারা লাল দই প্রভৃতির সোয়াদ নেবার চেষ্টা করলো। তবু মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সরকারি লাঞ্চ বা ডিনারে এ সমস্ত খাদ্যের আস্বাদ তিনি কিছুটা উপভোগ করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার রাজ্যের অধিবাসীরা ও-সবের আস্বাদন ভুলে গেছিল অনেককাল আগেই।

হাঁটতে হাঁটতে আরও খানিকটা এগিয়ে পার্ক স্ট্রীটে ঢুকলো নবজ্যোতি। পার্ক স্ট্রীট ও নিউমার্কেট অঞ্চল বরাবরই সাহেবী কেতাদুরস্ত ছিল। এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইংরেজ সাহেবরা খাটো হয়ে যাওয়ায় এদেশেও তাদের প্রভাব কমে গেছে। পার্ক স্ট্রীট ও নিউমার্কেটে এবং সংলগ্ন এয়ার-কণ্ডিশণ্ড মার্কেটে তাই এখন আমেরিকান ফেডেড জীনস্ পরা শিউপুজন দাসের নাতি নাতনী ববি, পাপ্পু, পিঙ্কি, নীনা ও জোনারা হুল্লোড় করে

বেড়াচ্ছে 'হাই হাই' সম্বোধন করে। ক্রিস মাসের দিন এবং নিউ ইয়ার্স ইভ-এ সেখানকার রেস্তোরাঁগুলোতে সারারাত ধরে জ্যাজ মিউজিকের সঙ্গে যে টুইস্ট, রক-এন-রোল ও ব্রেক ড্যান্স হয়েছে তা গত জন্মের কোন বঙ্গবাসী দেখলে নিশ্চয়ই ভাবতেন যে এই দেখেই রবীন্দ্রজী লিখেছিলেন "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

এবার একটা ট্যাক্সি নিয়ে বড়বাজারটা ঘুরে আসতে মনস্থ করলো নবজ্যোতি। পাগড়ী বাঁধা সর্দারজী ট্যাক্সি থামিয়েই জিজ্ঞেস করলো 'কিথে জানা?' বড়বাজার শুনেই সে আর ট্যাক্সির দরজা খুললো না। সোজা চলে গেল। আধ ঘণ্টা চেষ্টা করার পর অবশেষে সে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের কৃপাভাজন হ'তে সক্ষম হ'ল। কিন্তু ট্যাক্সি কিছুটা চলার পরেই এসপ্ল্যানেডের আগে বিরাট জ্যামের পিছনে আটকে গেল। কি ব্যাপার? শোনা গেল, ছট্ পরবের মিছিল যাচ্ছে বাবুঘাটে। নবজ্যোতি ট্যাক্সি থেকে নেমে গলা বাড়িয়ে দেখলো কাতারে কাতারে চলেছে ঠেলার মিছিল। ঠেলার উপরে নতুন পীলা কাপড় পরে বসে আছে চান্দু কী মাঈ, বৈজনাথ কী বহু, বাবুলাল কী চাচীরা। পুরুষরা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বড় বড় কলার কাঁদ, ঝুড়ি ভর্তি নারকেল, ফল, লাড্ডু, ঠেকুয়া প্রভৃতি উপাচার রয়েছে মাথায়। ঢাকীর বাজনার সঙ্গে সুর করে ওদের শাস বহু বেটা সকলেই গাইছে "কেলয়াকে পাত পর উগেলা সুরজবা, ঝাঁকেলা বরতিয়া মাঈ।" ঠেলার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে রাস্তায় দণ্ডি কেটে বুকে হেঁটে যাচ্ছে মানত রাখা বহু নারী ও পুরুষ। ফলে দুদিকেই দাঁড়িয়ে গেছে সারি সারি বাস, মিনি বাস, ট্যাক্সি। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পুলিশের সিগন্যাল দেখা গেল। নবজ্যোতির ট্যাক্সিও এবার নড়ে উঠলো। কিন্তু বড়বাজারে ঢোকার কিছুটা আগেই ট্যাক্সিআলা বললো 'আগে নেহি ঘুসে গা।' সত্যিই তো, ট্যাক্সি ঘুসবে কোথায়? বড়বাজারে যে কোন রাস্তাই নাই। আছে শুধু বেওসা, শুধু লেনদেন। যে

সরু ফালি জায়গাটুকু রয়েছে সেখানে হাজার লোক ধাক্কাধাক্কি করে কেনাবেচা করছে, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে চটজলদি খাবার ঠেলাগাড়ী দোকান থেকে। এর মধ্যে আবার কয়েকটা গরুও মানুষের সঙ্গে গুঁতোগুতি করে জায়গা করে নিয়েছে সেখানে, পাশেই চোনা ও নাদা নাদা গোবর, জলে কাদায় মাখামাখি। উপায় না দেখে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে নবজ্যোতি চিৎপুর রোডে ঢুকলো। এখন চিৎপুর রোডের নাম হয়েছে রবীন্দ্র সরণী। বিখ্যাত মানুষদের নাম তো এখন সর্বত্রই পদদলিত হচ্ছে এভাবে। কিন্তু সেখানেও শুধু গর্তে ভরা ট্রাম লাইনটুকু ছাড়া আর জায়গা নেই। নবজ্যোতির মনে হ'ল, একবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীটা কেমন আছে দেখলে হয়, কিন্তু খুঁজে পেল না কোথাও। ট্যাক্সি থামিয়ে রাস্তার ধারের দোকানে ফেজ টুপি পরা, চোখে সুরমা দেওয়া একজন লোককে জিজ্ঞেস করলো বাড়ীটার কথা। কিন্তু পানের রসে লাল ঠোঁট উল্টে লোকটি জবাব দিল, "ইধর ঠাকুরবাড়ী কোই হ্যায় নহী জনাব, ইয়ে মহল্লামে এক মসজিদ হ্যায়। আপ কাহাঁসে আয়ে হুয়ে হ্যায়?"

ক্লান্ত নবজ্যোতি তবুও হতাশ হ'ল না। আর যা কিছু যায় যাক্ কিন্তু কলেজ স্ট্রীটের বইপাড়া আছে নিশ্চয়ই। ট্যাক্সি ছুটে চললো সেদিকে। আশায় চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো নবজ্যোতির। হ্যাঁ, ঐ তো আছে। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে শীর্ণবক্ষ, জীর্ণবেশ কতকগুলি বঙ্গ সন্তান বস্তা বস্তা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সি থেকে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল নবজ্যোতি ওদের দিকে। বস্তাতে অজস্র বই—গল্প, আধুনিক কবিতা, জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ, সব আছে। নবজ্যোতি ভাবলো, যাক্ এটা কেউ দখল করতে পারেনি। একজন ছেলেকে সে জিজ্ঞেস করলো, "হ্যাঁ ভাই, বই-এর কাটতি ভালই আছে, তাই না?" ছেলেটি নির্লিপ্ত মুখে উত্তর দিল, "হ্যাঁ এখনও কিছুদিন আছে।"—"তা বইগুলো এমন বস্তায় করে রেখেছো কেন?" এবার অন্য একজন ছেলে আগ বাড়িয়ে তড়াক করে বলে

উঠলো, "ওগুলো সের দরে বিক্রী হবে যে।"—"তার মানে?" হ্যাঁ, ঐ শিউপুজন দাস আগ্রাসীওয়ালার নাতি জাপানে ও ম্যাঞ্চেস্টারে গিয়ে বছর পাঁচেক ট্রেনিং নিয়ে এসেছে, সে নাকি পুরনো কাগজ থেকে এক ধরনের সিন্থেটিক ফাইবার তৈরীর কারখানা খুলেছে। সেখানেই যায় এই বস্তা বস্তা বই। কেন? আজকাল বই যে কেউ পড়ে না। যে ক'জন বঙ্গবাসী আছে তারা শুধু লেখে। লিখলে পয়সা পাওয়া যায়। পড়ে কিছু হয় না। তাই সবাই লেখক—পাঠক নেই কেউ।

নবজ্যোতি আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না। সেদিনেরই ফ্লাইট ধরে সে দিল্লী চলে গেল। বঙ্গদেশের প্রতি যে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলবে, ধর্মঘট ডাকবে সে। বিমাতার মন তাতে কতটুকু গলবে কে জানে—কিন্তু নবজ্যোতির তো 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটা জায়গা হয়ে যেতে পারে।



অট্টালিকা ধ্বসিয়া চত্বারিংশজন বালক বালিকার
জীবন্ত সমাধি।

মঝঝম্‌ নিকায় বঙ্গভাষী

বঙ্গভাষীদের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব বর্দ্ধিত হতে দেখে দিবঙ্গত শঙ্করাচার্য খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। অত্যন্ত টেনসন নিয়ে তিনি খড়ম খট্‌ খট্‌ করতে করতে সোজা চলে এলেন নির্বাণলোকে। কিন্তু সনাতন ধর্মের প্রবক্তা শঙ্কর স্বর্গবাসী হলেও নির্বাণলোকে প্রবেশের অধিকার তাঁর নাই। তাই মোক্ষদ্বারে সজোরে করাঘাত করতে লাগলেন। নির্বাণলোক চঞ্চল হ'ল। বুদ্ধের শান্তিভঙ্গ হওয়াতে তিনি গবাক্ষ পথে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন,—'কে'? শঙ্করাচার্য মুণ্ডিত মস্তকের পিছনে দীর্ঘ শিখাগুচ্ছটি ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—'একবার বাইরে এস, হে মোক্ষদা (পুং)। পৃথিবীর সব প্রাণীর জন্য তো মোক্ষের পথ আবিষ্কার করে বসে আছ, তার আদমসুমারি খতিয়ানটা একবার দেখতে চাই।' বুদ্ধ শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলেন,—'আমি যে আর এই নির্বাণলোকের বাইরে বেরতে পারব না, বৎস শঙ্কর! আমি আমার ইনটেলেক-চুয়াল লেভেল ছাড়া অন্য কোথাও মেলামেশা করতে পারি না যে।' শঙ্করাচার্য আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। হাতের দণ্ডটি বাগিয়ে কর্কশ গলায় বললেন,—'তা তো বটেই। ঐ নির্বাণলোকের হিমঘরে বসে আঁতলামি করা তোমার বের করছি।' বুদ্ধের আস্কন্ধ লম্বিত কান দুটি লাল হয়ে উঠলো। তবু ধীর ভাবেই বললেন,—'দেখ শঙ্কর! তোমার অনুগামীরা তো রাম জন্মভূমি নিয়ে বাবরি মসজিদওয়ালাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেই। এর মধ্যে আবার আমার এই নির্বাণলোকের উপর তোমার রোষ জাগল কেন?' শঙ্করাচার্য বুদ্ধের কথা লুফে নিয়ে বললেন, —'সেই কথাই তো বলতে এসেছি। তোমাকে যে আমি এই সনাতন ধর্মের দেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত করে বিতাড়িত করেছিলাম, তুমি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পীতবর্ণদের দেশে

পীতাম্বর বিলি করতে চলে গিয়েছিলে, তা সেখান থেকে আবার মাইগ্রেট করে ফিরে আসার চেষ্টা করছ কেন? বুদ্ধের মুখে প্রসন্ন হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি হেঁ হেঁ করে বললেন,—'তাই তো হে দার্শনিক, তোমার দর্শন শক্তির বলিহারি যাই। তুমি যখন দক্ষিণ ভারত থেকে এসে উত্তর ও মধ্য ভারতে তোমার সনাতন ধর্মের জাল বিছানর জন্য ধাম প্রতিষ্ঠা করে খুঁটি 'গাড়ছিলে তখন কলিঙ্গের পরে আর পূর্ব দিকে বেশী এগোতে পারনি। ফলে একটা ভীষণ আর্দ্র উর্বরা স্থান তোমার ঐ জালের বাইরে রয়ে গিয়েছিল। ঐ আর্দ্র উর্বরা জায়গাটিতে আমি তখন আমার নীতির বীজ বপন করেছিলাম। আজ তাই শাকের ক্ষেতের মত ভরাট হয়ে গেছে।' শঙ্করাচার্য মুখ গোমরা করে বললেন,—'বটে? তা কোথায় সেই আর্দ্র উর্বরা জায়গাটি?' বুদ্ধ বিজয়ের হাসি হেসে বললেন, —'সে হচ্ছে বঙ্গভাষীদের রাজ্য। বঙ্গভাষীরা সকলেই বৌদ্ধ, তা জান কি?'—'কী? বঙ্গভাষীরা সকলেই বৌদ্ধ? বললেই হল? এ এক আজগুবি কথা। মাথা খারাপের লক্ষণ। নির্বাণলোকের ঠাণ্ডাঘরে বসে তোমার মাথার চিন্তা শক্তিও হিম হয়ে গেছে দেখছি। হ্যাঁ, বলে কিনা বঙ্গভাষীরা সকলেই বৌদ্ধ।' ফুঁসে উঠলেন শঙ্করাচার্য। বুদ্ধ বললেন,—'হ্যাঁ, যারা আমার নীতি এবং অনুশাসন মেনে চলে তাদেরকে তো বৌদ্ধই বলবে। তা আমি যদি প্রমাণ করে দিই যে বঙ্গভাষীরা সকলেই আমার নীতি ও অনুশাসন অনুসারে জীবনযাপন করে। তাহলে মানবে তো?' —'তার মানে?' গজরাতে লাগলেন শঙ্করাচার্য। আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বুদ্ধ তখন বললেন,—'বৎস শঙ্কর, আমার প্রধান তিনটি নীতি ও অনুশাসন হচ্ছে, যেমন ধর (১) মঝঝিম নিকায় অবলম্বন করা, (২) পঞ্চশীল পালন করা এবং (৩) ত্রিরত্ন অনুসরণ করা। আমি এক এক করে প্রমাণ করে দিচ্ছি যে বঙ্গপুঙ্গবরা সকলেই এই তিনটি নীতি ও অনুশাসন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে।'

মঝঝম্ নিকায় :

মঝঝম্ নিকায় মানে হচ্ছে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। তা এই বঙ্গভাষীদের মত এমন মধ্যপন্থী আর কোথায় দেখেছো, বল? প্রথমতঃ আকৃতির দিক থেকে বিচার কর। বঙ্গসন্তানরা ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের লোকদের মত দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ নয় আবার পূর্বাঞ্চলের লোকদের মত খর্বাকৃতি ও নরম নয়। তারা উত্তরাঞ্চলের ভূ-স্বর্গবাসীদের মত গৌরবর্ণও নয় আবার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীদের মত কৃষ্ণবর্ণও নয়। তারা মধ্যমাকৃতি ও মধ্যম বর্ণের লোক। বঙ্গভাষীদের প্রিয় কবিও একথা স্বীকার করে গেছেন যে 'মাথায় খাট বহরে ছোট'—এই মধ্যমাকৃতির বঙ্গ নন্দনদের প্রাণটি নাকি 'বোতাম আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান' থাকে সর্বদা।

দ্বিতীয়তঃ, জাতি তত্ত্বের বিচারেও এই বঙ্গভাষীরা মধ্যম বর্ণের লোক বলে প্রমাণিত। তাদের শরীরে বিশুদ্ধ আর্য রক্তধারাও নেই আবার অনার্য বা মোঙ্গলীয় রক্তধারাও সম্পূর্ণভাবে নেই। এই তিন রক্তধারার মিশ্রণে উদ্ভূত এক পাঁচন রক্ত বয়ে যাচ্ছে তাদের শিরা উপশিরায়। ফলে তাদের রক্তে তেজও নেই, ঝাঁঝও কম। আছে শুধু প্যাঁচ। এই প্যাঁচ কষেই তারা সর্বদা নিজেদের মাঝামাঝি জায়গায় নিরাপদে আসীন করে রেখেছে।

তৃতীয়তঃ বঙ্গ নন্দনরা আহারের বিষয়েও মধ্যপন্থী। তারা নিরামিষাশীও নয় আবার মাংসাশীও নয় অর্থাৎ তারা ভেজও নয় এবং নন-ভেজও নয়। বঙ্গভাষীরা প্রধানতঃ ফিসিটারিয়ান বা মাছাহারী। এ কথা সত্য যে অন্যান্য জাতির প্রভাবে বাঙালী হেঁসেলেও এখন পেঁয়াজ রসুন সহযোগে প্রায় সব রকম মাংসই প্রবেশ করেছে এবং দুর্মূল্য হওয়ার জন্য মাঝে মাঝে তাদের ভাতের থালার পাশে মাছের ঝোলের বাটিটি বাদ পড়ছে। কিন্তু এককথায় বাঙালী খাদ্য বলতে ভাত মাছের ঝোল বোঝায় কিনা, বল? মাছের ঝোল, ঝাল, অম্বল, ভাজা, ঘণ্ট, চচ্চরি প্রভৃতি এমন পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন আর কোন দেশের লোক প্রস্তুত করতে পারে বলে তুমি

শুনেছো ? তাছাড়া বঙ্গভাষীদের দেহের এই মধ্যপ্রদেশ বা উদরটিও যে সবচেয়ে বেশী সচল এবং এই মধ্য ভাগটিকে সক্রিয় রাখার জন্যই বঙ্গনন্দনরা যে সবচেয়ে বেশী সচেতন। পূজা পার্বনে, উৎসবে অনুষ্ঠানে এমন ভোগ এবং ভোজ খাওয়ার প্রথাই বা তুমি কোথায় দেখ ?

চতুর্থতঃ আর্থিক অবস্থার দিক থেকেও তো বঙ্গভাষীরা মধ্যম শ্রেণীর লোক। বাবা শঙ্কর, তুমি তো পদব্রজে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছো বলে জানি। আচ্ছা, কোন রাজ্যে তুমি 'মধ্যবিত্ত' এই শব্দটা তেমন-ভাবে শুনেছো কি ? অন্যান্য রাজ্যে ধনী আছে অথবা দরিদ্র আছে। কিন্তু বঙ্গভাষীরা ধনীও নয়, দরিদ্রও নয়, — তারা মালিকও নয় আবার শ্রমিকও নয়। বঙ্গভাষীরা হচ্ছে ঐ 'মধ্যবিত্ত' —অর্থাৎ তারা পুঁজিপতিও নয় আবার একেবারে সর্বহারাও বলা যায় না। কারণ তারা হচ্ছে মাইনে পাওয়া কলম-পেশা করণিক। সেইজন্যই তাদের সরকারী সচিবালয়কে বলা হয় 'রাইটার্স বিল্ডিং'। এদের কলমের জোরে মেদিনী কাঁপে। এই বঙ্গভাষীদের রাজ্যে প্রায় সমস্ত কলকারখানা, ব্যবসাবাণিজ্যের মালিক হচ্ছে ভিন রাজ্যের লোক, আবার কায়িক শ্রম করার যত শ্রমিক তারাও আসে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে। সবচেয়ে মজার কথা কি জান শঙ্কর ? এই বঙ্গপুঙ্গবরা তাদের রাজ্যের রাজধানী কলকাতা শহরের জন্য ভীষণ গর্বিত, যদিও সেই শহরের চেহারা এখন অশীতিপর লোলচর্ম বৃদ্ধের মত। কিন্তু আমার পথ অনুসরণ করে তারা সেই রাজধানীও ত্যাগ করে ভিন রাজ্যের লোকদের দান করে দিয়েছে।

পঞ্চমতঃ, বঙ্গভাষীরা রাজনীতিতেও মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলাই শ্রেয় মনে করে। তারা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রেও বিশ্বাস করে না আবার রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথও 'ভাষণ-তান্ত্রিক রাজনীতি' নামে এক নতুন ইডিওলজির প্রবক্তা হয়ে পৃথিবীর নজির সৃষ্টি করেছে। এই ইডিওলজির প্রধান হাতিয়ার

হচ্ছে মিছিল ও সমাবেশ। সেইসব মিছিল ও সমাবেশ যে ভাষণের বোমা নিক্ষিপ্ত হয় তা পরমাণু বোমার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। এরপর যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয় তবে এই বঙ্গভাষীরা ভাষণ বোমা ফাটিয়ে শত্রু পক্ষকে কুপোকাত করে ফেলবে এক মুহূর্তে। এমন অহিংস যুদ্ধ তোমার রামভক্ত মোহনচাঁদও কল্পনা করতে পারেননি। শুনেছি, পৃথিবীর শীর্ষ নেতারা নাকি নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ের আলোচনায় এই ভাষণ বোমার শক্তি নিয়েও চিন্তা ভাবনা করছে। কিন্তু বঙ্গভাষীদের ভাষণ বোমা প্রস্তুত করার বিষয়ে কোন 'ভেটো' দেবার ক্ষমতা তাদের নাই।

পঞ্চশাল :

বৎস শঙ্করাচার্য, বঙ্গভাষীরা শুধু আমার মঝঝম্ নিকায় অনুসরণ করে, তাই নয়। তারা আমার পঞ্চশীল নীতিও যথাযথ-ভাবে পালন করার চেষ্টা করে। এ বিষয়েও আমি তোমায় প্রমাণ দিচ্ছি। পঞ্চশীলে বলা হয়েছে, (১) প্রাণী হত্যা করো না, (২) চুরি করো না, (৩) মিথ্যা কথা বলো না, (৪) মদ্যপান করো না, (৫) ব্যাভিচার করো না। তা বঙ্গভাষীরা এই শীলগুলি মেনে চলে।

প্রথমে ধরা যাক প্রাণী হত্যার কথা। শঙ্কর, বঙ্গভাষীরা মাছাহারী বলে তোমার নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে উঠছে। কিন্তু ওদের ঐ এক টুকরো বরফচাপা মাছ খাওয়াকে কি তুমি হিংসা বা প্রাণী হত্যা বলবে? ঐ মাছের প্রাণ তো কবেই চলে যায় ডাঙ্গায় তোলার সঙ্গে সঙ্গে, এরপর বরফে চাপা থাকতে থাকতে রক্তটুকুও জমে যায়। সেই মাছ যখন আগুনের জ্বালে পরিশুদ্ধ হয়ে নানা মশলা সহযোগে পাক হয়ে ব্যঞ্জনরূপে থালার পাশে আসে তখন যে তাতে প্রাণীজ ভিটামিন বা প্রোটিনটুকুও থাকে না। একে প্রাণী হত্যা বলা যায় কি? তা যদি বল তবে তো তোমার শাকসবজি খাওয়াও প্রাণী হত্যা করা। জান তো, ঐ বঙ্গভাষী একজন বিজ্ঞানীই আবিষ্কার করেছিলেন যে গাছেরও প্রাণ আছে। বঙ্গভাষীরা হিংসটে বটে, কিন্তু হিংস্র নয় মোটেই। তাছাড়া প্রাণী হত্যা করতে যে প্রাণশক্তির দরকার

তা কি ঐ ক্ষীণজীবী বঙ্গসন্তানদের আছে? নেই বলেই তো তাদের কবি প্রার্থনা করেছেন, 'মোরে আরও আরও আরও দাও প্রাণ।'

চুরি না করার বিষয়টির উত্তর তুমি মঝঝম নিকায় তত্ত্ব থেকেই পেতে পার, শঙ্কর। বঙ্গসন্তানরা যদি চুরিই করবে তবে আর তারা মধ্যবিত্ত থাকবে কেন? সারা ভারতবর্ষে যখন সরকারী অর্থের পুকুর চুরি হয়ে যাচ্ছে তখন এই মাইনে করা কলমপেশা বঙ্গভাষীরা অর্দ্ধেক মাইনে ইনকাম ট্যাক্স দিয়ে ও অর্দ্ধেক অ-বঙ্গভাষী দোকানদারদের পকেটে দিয়ে কোনরকমে দিন গুজরান করে চলেছে। হ্যাঁ, তুমি অবশ্য বলতে পার যে সব অফিস আদালতে ঐ কলমপেশা কর্মীগুলো সামান্য একটা ফাইল এ টেবিল থেকে ওই টেবিলে চালানর জন্য বাঁ হাতটা সর্বদা বাড়িয়ে দেয়। সেটা তো আর চুরি করা হল না, বরং বলা যায় ভিক্ষা করা। আমি তো আমার ভিক্ষু শ্রমণদের এই ভিক্ষা পাত্র হাতে নেবার দীক্ষাই দিয়েছিলাম। বঙ্গভাষীরা সেই আদর্শ অনুসরণ করেই তো সত্যিকারের বৌদ্ধ শ্রমণ হয়ে উঠেছে,-- -অর্থাৎ শ্রম নয় বা শ্রম না করার নীতি পালন করে বলেই তো তারা শ্রমণ।

বঙ্গভাষীদের মিথ্যা ভাষণের অপবাদ দেওয়াও বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তারা বচনের পাইকারী কারবার করে। নীলামে কথার বস্তাটা যদি কোন বঙ্গনন্দন একবার ধরে ফেলতে পারে, ব্যাস তাহলে আর চিন্তা নাই। ভর্ ভর্ হর হর করে কথার তুবড়ি ফুটতে থাকবে অনর্গল। তবে সেই কথার বস্তায় দুই একটি এদিক ওদিক অসত্য বাক্য যে থাকে না তা বলছি না। কিন্তু শঙ্কর, কোন ব্যবসায়ী যখন নীলামে মাছের ঝুড়ি কেনে তখন তাতেও তো দু একটি পচা মাছ থাকতে পারে। তাই বলে পুরো ঝুড়িটা তো পচা মাচের ঝুড়ি বলে ফেলে দেয় না। সেই রকম আলুর বস্তা, ফলের টুকড়ি, চিনির পেটিতেও তো কত পচাধচা, মিশেল ভেজাল জিনিষ থাকে। তবু সে সমস্ত জিনিষ তো লোকে দিব্যি ভাল বলে সওদা করে আনে, দোকানদার বাছতে পর্যন্ত দেয় না। সুতরাং

বঙ্গভাষীদের কথার বন্যাতেই বা তুমি মিথ্যা কথা বাছতে যাবে কেন? তাছাড়া তাদের ভাষণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রবাহে কখনও কখনও সত্য গোপন করা হলেও মিথ্যা কথা বলা হয় না। অন্ততঃ সেটা মিথ্যা কথা কিনা তা আদালতেও প্রমাণ করা যায় না, সবই অশ্বত্থমা হতঃ ইতি গজ। সব সত্যি কথা।

এবার মদ না খাওয়ার শীলের কথায় এস। শঙ্কর, বিষে বিষ ক্ষয় কথাটা মান তো? সেই রকম একটা নেশা থাকলে আর কোন নেশা মানুষকে মাতাল করতে পারে না। বঙ্গনন্দনরা যে এক তীব্র নেশায় মাতোয়ারা হয়ে আছে, মদ আর তাদের মাতাল করতে পারে না। সে নেশা আধুনিক কবিতা ও নাটক। নব্য বঙ্গে এখন বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন সব বিষয় 'মেটেরিয়ালিষ্টিক' বলে পরিত্যাজ্য হয়েছে। শুধুমাত্র আধুনিক কবিতার মিনি পত্রিকা সম্পাদনা করা ও পাড়ায় পাড়ায় নাটক দল গড়ার সাংস্কৃতিক রসে তারা আপ্লুত হয়ে আছে। এই রসের প্লাবন ছাপিয়ে অন্য কোন প্রকার মদই আর তাই বঙ্গভাষীদের সঞ্জীবিত করতে পারে না। তাদের সকল রসের ধারা এসে ঐ কাব্য ও অভিনয়ে আত্মহারা হয়ে গেছে।

দেখ শঙ্কর, বঙ্গভাষীরা ব্যাভিচার করে এমন কুৎসা রটনা করাও ঘোর অন্যায় হবে। ঐতিহাসিক তথ্যে পাওয়া যায় যে একদিন উত্তর ভারতের আর্য বলয় থেকে কুলীন ব্রাহ্মণরা গিয়ে নাকি বঙ্গভাষীদের মধ্যে কুলীন প্রথা প্রচলন করেছিলেন। সেই যুগে কুলীন ব্রাহ্মণরা শতাধিক বিবাহ করতেন বলে তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের নামে তো ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়া হয়নি। আজ হিন্দু বিবাহ আইন পাস করে তাদের সেই ঐতিহ্যের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বঙ্গভাষীরা তো চারটি পর্যন্ত বিবাহ করার এবং ইচ্ছেমত তালাক দেবার অধিকারী। তাদের বেলাতেও কোন ব্যাভিচারের প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অ-মুসলিম বঙ্গভাষীরা বিবাহ অতিরিক্ত সামান্য দুই একটি ফষ্টি-

নষ্ট করতে ইচ্ছে করলে তা ব্যাভিচার বলা হবে কেন? তোমরা কি রোজ শুধুমাত্র ডাল দিয়ে ভাত খেতে পার? বিয়ে করা বৌ যে ঐ ডালের মতই কিছুদিন পরে বিস্বাদ হয়ে যায়। সুতরাং মুখ বদলানোর জন্য যে বঙ্গভাষীরা সামান্য একটু অনাচার করে তারা প্রকৃতপক্ষে ঐ কুলীন ঐতিহ্যের অনুসারী। তাদেব আচরণ একটু ঢিলেঢালা বলে ব্যাভিচারের দোষে দোষী করা উচিত হয় কি?

শঙ্করাচার্য বুদ্ধের অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না। তবুও একেবারে হেরে না যাওয়ার চেষ্টা করে বললেন, 'ত্রিরত্নের শরণ না নিলে কি বৌদ্ধ হওয়া যায়? বঙ্গভাষীরা কি ত্রিরত্ন অনুসরণ করে?' বুদ্ধদেব গবাক্ষের দেওয়ালে চাপড় মেরে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—'আলবাৎ করে। বিশ্বাস না হয় সেটাও প্রমাণ করে দিচ্ছি।'

ত্রিরত্ন ঃ

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি —এই হচ্ছে ত্রিরত্ন। বঙ্গভাষীরা এই ত্রিরত্ন শরণ করেই তো তরে যাচ্ছে। বুদ্ধং শরণং মানে বুদ্ধির বা জ্ঞানের অনুসরণ করা — আধুনিক ভাষায় যাকে বলা হয় আঁতেকচুয়ালিজম। বঙ্গভাষীদের মত এমন আঁতেকচুয়াল জাত আর কোন দেশে দেখেছো নাকি? সকলেই জ্ঞানী বুদ্ধ, সব জান্তা জ্ঞানদা (পুং)। জ্ঞান দানের মওকা একবার পেলেই হল, তাজা মাজার মত দেহ-রূপ বোতল থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসতে থাকে সুস্বাদু জ্ঞান ও বুদ্ধি। সেই জ্ঞান দাদা হোক না কেন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া একজন অফিসের দপ্তরী অথবা প্রাথমিক স্কুল পালান এক মিনি বাসের কণ্ডাক্টর। তাদের জ্ঞানগর্ভ প্রবচন শুনলে মনে হয় যেন সারা রাজ্যটাই একটি বোধিবৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষ তলে বসে সকলেই জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে বুদ্ধত্ব লাভ করছেন। এই বুদ্ধ অনুসারী জ্ঞানদারা এমন নিষ্কাম অর্থাৎ কর্মহীন সাধনায় মগ্ন হয়ে

আছে যে তাদের সমস্ত রাজ্যটাই নির্বাণের পথে ধাবিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষীদের রাজ্য বলে আর কোন স্থানই সম্ভবত থাকবে না। সবই নির্বাণ লাভ করে নির্বাপিত হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় রত্ন ধম্মকে আধুনিক ভাষায় বলা হয় ইজম্ বা ইডিওলজি। বঙ্গভাষীরা এই ইজমের জন্য জান লড়িয়ে দিতে প্রস্তুত। এই ইজম ভক্তরা যে কোন মূল্যেই ইজমের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে বদ্ধপরিকর। প্রিয়দর্শী অশোক যেমন তার মহামাত্রদের নিয়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ করে, স্তম্ভ ও স্তূপ নির্মাণ করে আমার বাণী প্রচার করেছিলেন, তেমনি বঙ্গভাষী মুখ্যমন্ত্রীও তার ভক্তদের নিয়ে দেওয়াল লিপির সাহায্যে ইজম প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করে চলেছেন। প্রিয়দর্শী অশোকের পর এমন ধম্ম বা ইজম অনুসারী শাসক এই ভারতভূমিতে আর জন্মগ্রহণ করেনি। শুধু কি তাই? যুদ্ধ পিপাসু চণ্ডাশোক যেমন ধর্মাশোকে পরিবর্তিত হয়েছিলেন তেমনি রক্তাক্ত বিপ্লববাদী মুখ্যমন্ত্রীও শান্তিপ্রিয় 'গদিবাদী' হয়ে গিয়েছেন এবং ভক্তকুলের সাহায্যে সেই গদি নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করে ধম্মং অর্থাৎ ইজমং শরণ করছেন। দেখ শঙ্কর, এই জাতপাতহীন সাম্য ধম্ম তো আমিই প্রথম প্রচার করি। তবে আজকাল একটু বিদেশী লেবেল না লাগালে কোন জিনিষ তেমন বিকায় না। এইজন্য ইজম ভক্তরা বিদেশী দাদার নামটা ব্যবহার করে! নইলে ওরা তো আমারই অহিংসার পথ অবলম্বন করে আমারই 'ধম্ম' প্রতিষ্ঠায় ব্রতী।

তৃতীয় রত্ন সঙ্ঘের কথা আর বিশদভাবে বলার কি আছে? শঙ্কর, তোমাকেও নিশ্চয় কোন সময়ে এই সঙ্ঘ বা ইউনিয়নের মোকাবিলা করতে হয়েছে? কে না জানে, বঙ্গভাষীরা সঙ্ঘের শরণার্থী—সঙ্ঘই তাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞান উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল থেকেই তারা কোন না কোন সঙ্ঘের সদস্য হয়ে শ্রমণত্ব গ্রহণ করে। সারাজীবন এই সঙ্ঘকে অবলম্বন করেই তারা বাঁচে। সঙ্ঘ শক্তিতে তাদের বল। এই সঙ্ঘের মাধ্যমে রাষ্ট্রশক্তিকেও

তারা অকেজো করে দিতে পারে, কলকারখানা, অফিস আদালত, ডক বন্দর, স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত তো সঙ্ঘের চাপে পঙ্গু হয়ে গেছেই। শ্রমিক কৃষক, ঝি, চাকর, কেরানী, দোকানী, পানওয়ালা, ভুজিওয়ালা, মুচি, জমাদার থেকে শুরু করে শিক্ষক অধ্যাপক, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার, উকিল মোক্তার, আমলা মন্ত্রী সকলেই কোন না কোন সঙ্ঘের আশ্রিত। সঙ্ঘ ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করাই মুস্কিল। জীবিকা অর্জন শুরু করার আগেই সঙ্ঘের শরণ নিতে হয়। সঙ্ঘে আশ্রয় পেলে জীবনের সব সমস্যার সমাধান সহজেই হয়ে যায়। খুন জখম ধর্ষণ বা অন্য যে কোন অপরাধ-মূলক কাজ করলেও সঙ্ঘের আশ্রয়ে এসে পাপ মুক্ত হয়ে যায়। এই সঙ্ঘ কেন্দ্রিক বঙ্গভাষীদের তাই নির্বাণলোকে রিজার্ভেশন পাওয়ার বিষয়টি একেবারে সুনিশ্চিত।

সুতরাং হে বৎস শঙ্করাচার্য! তুমি এই জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত বৌদ্ধিক, ধম্ম বা ইজম অনুসারী ও সঙ্ঘ অনুগত বঙ্গনন্দনদের বৌদ্ধ বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করবে কি? এই বঙ্গভাষী বৌদ্ধরা অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের যে নতুন ব্যাখ্যা ও নতুন পদ্ধতি প্রচলন করেছে তুমি বরং তা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যেও প্রচার কর যাতে সারা ভারতেই লোক নিষ্কাম শ্রমণ হয়ে ওঠে।

দুরভাষের দৌরাত্ম্য

(নাটিকা)

প্রথম দৃশ্য

নাটকের দৃশ্য উঠলে দেখা গেল মঞ্চে একটি ল্যাবরেটরির ঘর। একজন প্রখ্যাত অধুনা প্রয়াত বিজ্ঞানী তাঁর স্বর্গীয় আবাসে ঐ ল্যাবরেটরিতে গবেষণায় গভীরভাবে মগ্ন হয়ে আছেন। চারিদিকে ছড়ান রয়েছে তামার তারের রীল, নাটবলটু, হাতুরি-ছেনি, প্লাস স্ক্রু-ড্রাইভার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে আগত এই বিজ্ঞানী পূর্বজন্মে টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙ্গে' বলে একটা প্রবাদ আছে। এই বিজ্ঞানীটিও স্বর্গের শান্তিধামে পেঁছেও শান্তিতে বসে থাকতে পাবেন না। স্বর্গের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে বিস্তর ঘোরাঘুরি করে সম্প্রতি একটি সরকারী কণ্ট্রাক্ট আদায় করেছেন। এখন আন্ত-ব্রহ্মাণ্ড একটি টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার জন্য তিনি গবেষণায় ব্যস্ত। সময় কত হয়েছে খেয়াল নেই। এমন সময় বিদেশী দেওয়াল ঘড়িতে ছোট্ট মুরগীর ছানা বেরিয়ে এসে কুক্কু, কুক্কু, কুক্কু, কুক্কু করে জানিয়ে দিল বিকেল ৪টে বেজেছে। বিজ্ঞানীর চমক ভাঙ্গল। তিনি কলিং বেল বাজালেন। কিন্তু তাতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আবার বেল টিপলেন। না, কেউ এল না। বিজ্ঞানী অপ্রসন্ন মুখে ভিতরের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং গলার স্বর চড়িয়ে ডাকলেন—'জিম্'। এবার বছর চোদ্দর একটি বয় দৌড়ে ঘরে এল, —'স্যার'।

বিজ্ঞানী—'কোথায় থাক? ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না।'

জিম—'স্যার, আমি কেরোসিনের লাইনে ছিলাম। এইমাত্র ছুটতে ছুটতে এলাম।'

বিজ্ঞানী—'চা দাও। আমি ৪টের সময় চা পান করি তা রোজ মনে করিয়ে দিতে হয় কেন?'

জিম—'জানি স্যার, কিন্তু গ্যাস ফুরিয়ে গেছে। তাই আমি কেরোসিন জোগাড় করতে গিয়েছিলাম। সেই সকালে জ্যারিকেন দিয়ে লাইন দিয়েছিলাম, এখন মাত্র হাফ্ লিটার তেল পেলাম।'

বিজ্ঞানী (গলার স্বর রুদ্ধ)—'গ্যাস নেই তা দোকানে গিয়ে নতুন সিলিণ্ডার বুক করনি কেন?'

জিম—'আগেই বুক করেছি, —দেড় মাস হয়ে গেল। আজও সাপ্লাই দেয়নি।'

বিজ্ঞানী—'এক্ষুণি যাও। আমার নাম করে বল যেন ভি. আই. পি কোটা থেকে একটা সিলিণ্ডার আজই পাঠিয়ে দেয়।'

জিম—'তাও বলেছিলাম, স্যার। ওরা বলেছে যে বিজ্ঞানী, গবেষক, আবিষ্কারক, অধ্যাপক এরা বিদ্বান পণ্ডিত হতে পারেন, কিন্তু ভি. আই. পি নন। কোন কোটা থেকেই ওদের জন্য ব্যবস্থা করার উপায় নেই। ভি. আই. পি. শুধু মন্ত্রীরা ও তাদের অনুচররা।'

বিজ্ঞানী—'কী? আচ্ছা, তুমি ইন্দ্রলোক ট্রেডিং করপোরেশন-এর লাইনে রিং কর, আমি নিজে কথা বলবো।'

জিম (কাঁদ কাঁদ গলায়)—'স্যার, টেলিফোনও আজ দু'দিন হ'ল একেবারে ডেড হয়ে আছে।'

বিজ্ঞানী (যদিও নাস্তিক, তবু স্বগোক্তি করে উঠলেন)—'ওঃ গড! একি যন্ত্রণা। (জিমের প্রতি)—তুমি কমপ্লেন করেছো কি?

জিম—'করেছি, স্যার।'

বিজ্ঞানী—'তাহলে রিপেয়ার করতে আসেনি কেন?'

জিম—'ওরা বলেছে পনের দিনের আগে হবে না।'

বিজ্ঞানী (হাত মুঠো করে শূন্যে ঘুষি মেরে)—'কেন?'

জিম—'পরশু রাত্রে যে ঝড় হয়েছিল তাতে রাস্তার ধারের একটা

গাছ টেলিফোন তারের উপরে ভেঙ্গে পড়েছে। সেটা না সরালে কিছু করা যাবে না।'

বিজ্ঞানী—'তা, সেই গাছ দু'দিন ধরে সরান গেল না ?'

জিম—'গাছটা বন বিভাগের। বন বিভাগ থেকে না সরালে টেলিফোনের লোকেরা কাজে হাত দিতে পারবে না।'

বিজ্ঞানী—'কতদিন এই টালবাহান চলবে কিছু খবর পেয়েছো ?'

জিম—'বন বিভাগ গাছ কাটার জন্য কোটেশন চেয়েছে, শুনেছি।'

বিজ্ঞানী—'জাহান্নামে যাক। ওরা কারা ? এদের স্বর্গধামে ঢোকাল কে ?'

জিম—'স্যার, শুনলাম যে ওরা নাকি বেশীর ভাগই ভারতবর্ষ থেকে এসেছে। ওদের মর্ত্যখণ্ডে ওরা নাকি এভাবেই কাজ শিখেছে।'

বিজ্ঞানী—'হরিবল। এভাবে অনুপ্রবেশ ঘটলে যে স্বর্গধামেও আর পা রাখার জায়গা থাকবে না।'

জিম—'এর জন্য বিজ্ঞানীদেরকেই সকলে দায়ী করছে, স্যার। আপনি কি দেওয়ালে পোস্টার পড়েননি ? তাতে লিখেছে, 'বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকদের স্বর্গে ঢোকা বন্ধ কর, রুখে দাও।' বিজ্ঞানীরা যে আণবিক বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করেছে তাতেই নাকি এত লোকের একসঙ্গে স্বর্গে প্রবেশ করার পথ সহজ হয়ে গেছে। সেই অস্ত্রশস্ত্র যে বেশী তৃতীয় বিশ্বের উপরই প্রয়োগ করা হচ্ছে। আর তাই এমন জনসংখ্যা বেড়ে গেছে এখানে। বার্দ্ধক্যের পারমিট ছাড়াই সকলে ঢুকে পড়েছে।'

বিজ্ঞানী—'তুমিও তো দেখছি বেশ তুখোর হয়ে গেছ। সারা-দিন বোধহয় দলবাজি করে বেড়াচ্ছ ?'

বিজ্ঞানী আর কথা বাড়ালেন না। জিমের প্রতি ধমকের সুরে বললেন—'পাকামি না করে যাও আমার চা নিয়ে এস।'

মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল জিম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

এক পক্ষকাল পর। বিজ্ঞানীকে আবার দেখা গেল সেই ল্যাবরেটরিতে কাজ নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন। কখনও বড় প্র্যাকটিক্যাল খাতায় খস্‌খস্‌ করে কিছু লিখছেন আবার উঠে যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করছেন। দেওয়াল ঘড়িটা বেজে চলেছে টিক্‌ টিক্‌ করে। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং ক্রিং—টেলিফোনটা বেজে উঠলো। বিজ্ঞানীর মুখে আনন্দের হাসি ছড়িয়ে পড়লো। থ্যাঙ্ক্‌ গড, টেলিফোন ঠিক হয়েছে অবশেষে। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে তিনি বললেন, —'হ্যালো।'

অপর প্রান্তের কণ্ঠ—'হা—লো···। বাণারসীদাস গজাননজী হ্যায় ক্যা? উনহে দেনা জী।'

বিজ্ঞানী—'কিতনা নম্বর মাঙ্গতা হ্যায় আপ?' (স্বর্গধামে ভারতীয়রা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়াতে হিন্দি ভাষাও যথেষ্ট প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। প্রয়াত বিজ্ঞানীও এই ভাষা কিছুটা রপ্ত করে গিয়েছেন)।

অপর প্রান্ত—'ইয়ে বানারসীদাসজী কী গদি হ্যায় নু? উনহে বোল না কি তেল কা ভাও বড় গিয়া। গুদাম কা তেল তুরন্ত ন ছোড় না জী।'

বিজ্ঞানী—'দিস্‌ ইজ্‌ রঙ নাম্বার—দুসরা নম্বর।'

অপর প্রান্ত—'কিতনা নম্বর জী? কাঁহা সে বোঁলে জী? হাঁ জী······'

বিজ্ঞানী ঠকাস্‌ করে রিসিভার রেখে দিলেন। নিজের চেয়ারে এসে বসলেন ব্যাজার মুখে। কাজে মন দেবার চেষ্টা করলেন।

একটু পরেই আবার ক্রিং ক্রিং ক্রিং। বিরক্ত হলেও রিসিভার তুললেন তিনি।

বিজ্ঞানী—'ইয়েস্‌—এডিসন স্পিকিং।'

এক মহিলা কণ্ঠ—'রবীন আমি ইভনিং শো-এর টিকিট কিনে এনেছি। তুমি কিন্তু তাড়াতাড়ি চলে এস।'

এক পুরুষ কণ্ঠ—'হ্যালো···এটা কি H55000?' (পঞ্চত্ব প্রাপ্তির প্রতীক হিসাবে স্বর্গের সব টেলিফোন নম্বর ডবল ফাইভ দিয়েই হয়)।

দ্বিতীয় পুরুষ কণ্ঠ—'মিলি, আজ যে আমি ভীষণ ব্যস্ত, বোর্ড মিটিং আছে। তুমি রুমাকে নিয়ে চলে যেও।'

বিজ্ঞানী—'হ্যালো। কত নম্বর চাচ্ছেন? এটা H55000।'

মহিলা কণ্ঠ—'হ্যাঁ, তুমি সব সময় ব্যস্ত রবীন। আমার কোন ইচ্ছের মূল্য নেই তোমার কাছে।'

প্রথম পুরুষ কণ্ঠ—হ্যালো হ্যালো। কে বলছেন? মিঃ এডিসন, খুব আরজেন্ট ম্যাটার। লাইন ডিসটার্ব হচ্ছে। হ্যালো হ্যালো।'

দ্বিতীয় পুরুষ কণ্ঠ—'আমায় আজকের মত ক্ষমা কর মিলি, প্লীজ। আমি শনিবার নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে প্রোগ্রাম করব।'

বিজ্ঞানী—'হ্যালো—হ্যালো—লাইন ছেড়ে দিন। আমার আরজেন্ট কল আছে। ভেরী আরজেন্ট, প্লীজ।'

মহিলা কণ্ঠ—'তোমার সবকিছু আরজেন্ট, শুধু আমার বিষয় ছাড়া। আমাকে যে গ্র্যান্টেড ভেবে নিয়েছো। আচ্ছা, আমিও দেখবো।' ফোঁপানির আওয়াজ।

বিজ্ঞানী—'হ্যালো হ্যালো। কে রবার্ট? শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো হ্যালো···'

ফোনের লাইন কেটে গেল। রিসিভার ছুঁড়ে ফেললেন বিজ্ঞানী। বিষণ্ণ মনে চেয়ারে মাথা হেলিয়ে বসে পড়লেন। রবার্টের গলা শুনতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রশ-কানেকশন হয়ে যাওয়ায় কথা বলা গেল না। রবার্ট বোধহয় কোন খবর দিতে চেয়েছিল। বিজ্ঞানী কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। রবার্ট আবার রিং করতে পারে। কিন্তু না, কিছুই এল না। তিনি উঠে ফোনের কাছে

গেলেন এবং নম্বর ডায়াল করতে শুরু করলেন। কিন্তু যতবার ডায়াল করেন একটি একঘেয়ে প্যানপেনে মহিলা কণ্ঠ বেজে ওঠে বার বার—"হেভি কনজেশন ইন দিস লাইন, প্লীজ ডায়াল আফটার সামটাইম—হেভি কনজেশন ইন দিস লাইন, প্লীজ ডায়াল আফটার সামটাইম—হেভি কনজেশন ইন দিস লাইন, প্লীজ ডায়াল আফটার······"

বিজ্ঞানী ফোনের উপরে একটা ঘুষি মেরে রিসিভারটা ঠক্ করে রাখলেন। ক্লান্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করতে লাগলেন।

বিজ্ঞানী—'এ একেবারে অসহ্য। এ কোন স্বর্গসুখে বাস করছি আমরা? এই গবেষণার জন্য কত যে বিনিদ্র রাত কাটিয়েছি—তার পরিণতি কি হল?'

হঠাৎ দরজা ঠেলে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো তাঁর সহকারী রবার্ট, কোন অনুমতি না নিয়েই। স্বর্গের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়াতেও তার কপালে ঘাম জমেছে। মনে হয় ছুটতে ছুটতে এসেছে, হাঁপাচ্ছে এখনও। বিজ্ঞানীর চোখ মুহূর্তে জ্বলজ্বলে হয়ে গেল।

বিজ্ঞানী—'ও রবার্ট! তোমাকেই ফোন করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু যা অবস্থা টেলিফোনের······'

রবার্ট—'হ্যাঁ স্যার। আমিও যে কী চেষ্টা করছিলাম, না পেয়ে ছুটে এলাম। সর্বনাশ হয়ে গেছে, স্যার।'

বিজ্ঞানী (বিস্মিত স্বরে)—'কেন, কী হয়েছে?'

রবার্ট—'স্যার, আপনার আন্তঃব্রহ্মাণ্ড টেলিকম থিওরি লাল দেশের 'প্রাগদা' পত্রিকায় প্রকাশ হয়ে গেছে।'

বিজ্ঞানী—'সে কি? ননসেন্স। তা কি করে সম্ভব? আমি তো কোথাও কোন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিইনি।'

রবার্ট—'আমিও তো আশ্চর্য হয়ে গেছি, স্যার। এটা কী করে সম্ভব হল? আমার মনে হচ্ছে যে এখানে এই স্বর্গধামে যে প্রয়াত লালদেশীয় কে. ডি. বি. গুপ্তচররা আছে এটা তাদের কাজ।

আপনি যখন মাঝে মাঝে টেলিফোনে আমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করতেন তখন নিশ্চয়ই ওরা কোন ট্যাপ করে জেনেছে।'

বিজ্ঞানী (কপালে হাত দিয়ে)—'হায়! একি দুরবস্থায় রয়েছি।'

রবার্ট—'স্যার, আপনি যে গত জন্মে সম্মিলিত রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন। লালদেশীয়রা আপনার মরণোত্তর কাজকর্মের উপরেও নজর রাখার জন্য ওদের স্বর্গত কে. ডি. বি. গুপ্তচরদের লাগিয়ে রেখেছে। তবে ভয় নেই, স্যার। আমাদের সম্মিলিত রাষ্ট্রের এস. ই. আই. এখানে কম নেই। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় লাখ লাখ এস. ই. আই. স্বর্গে এসেছে। এবার ওদেরও কাজে লাগাতে হবে। লালদেশীয়রা তো শুধু গ্লাস-নস্ট করছে—আমরা পিপে-নস্ট করবো।'

বিজ্ঞানী—'তাতে আর কী লাভ বল? আমার থিওরি তো লিক আউট হয়ে গেল।'

বিজ্ঞানীর কণ্ঠে হতাশার বেদনা ফুটে উঠলো। চোখ বন্ধ করে তিনি চেয়ারে বসে রইলেন।

রবার্ট তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য আমতা আমতা করে বলতে লাগলো।

রবার্ট—'আপনি, স্যার, নতুন কোন বিষয় নিয়ে এবার কাজ শুরু করুন। ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন, স্যার। আমার মনে হয়, টেলিকম ব্যবস্থা ছেড়ে আপনি এবার আন্ত-ব্রহ্মাণ্ড টেলিপ্যাথি যোগাযোগ উদ্ভাবন করুন।'

বিজ্ঞানী (হতাশ কণ্ঠে)—'তাতেও আর সুবিধা করা যাবে না, রবার্ট। তুমি জান না যে স্বর্গধাম এখন ভারতবাসীতে ভরে গেছে। ওরাই মেজরিটি। বন্যা, রেলগাড়ী সংঘর্ষ, বিমান দুর্ঘটনা, বাস খাদে পড়া, উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত ও সর্বোপরি দলীয় দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়ে ভারতীয়গুলো দলে দলে এই অমর্ত্যলোকে প্রবেশ করছে। ওরা আমার টেলিপ্যাথি তত্ত্ব ফাঁস করে দেবে।'

রবার্ট—'তা কেমন করে করবে?'

বিজ্ঞানী—'ভারতবর্ষ নামে ঐ ভিখিরি দেশটার মানুষগুলো যোগ জানে। নতুন করে তারা যোগ ও ধ্যান চর্চা শুরু করেছে। ঐ যোগ ও ধ্যান শক্তিতে ওদের একজন নেংটি পরা নেতা যুদ্ধ না করে অহিংস পথে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজদের পর্যন্ত হটিয়ে দিয়েছে! আমরা আণবিক বোমা ফেলেও জাপান জয় করতে পারিনি, ভিয়েতনাম থেকে হটে এসেছি। ওরা যোগের মাধ্যমে হাজার হাজার বছর আগের শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য দিবঙ্গত দেবদেবীর সঙ্গেও অনায়াসে যোগাযোগ রাখে।'

রবার্ট—'কিন্তু স্যার, অপমৃত্যু হলে স্বর্গলাভ হয় না বলে ভারতীয় পুরাণে নাকি বিধান আছে শুনেছি। ওদের অপমৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও স্বর্গে আসছে কেমন করে?'

বিজ্ঞানী—'সেই পুরাণের বিধান অনেক পুরনো হয়ে গেছে, রবার্ট। ওদের দেশেই প্রবাদ প্রচলিত আছে যে 'স্বভাব না যায় মরলে, ময়লা না যায় ধুলে'। মরার পর সব কিছু জগতে ফেলে এলেও স্বভাবটা আত্মার সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। তাই ওদের জাতীয় স্বভাবের জোরে ওরা দিব্যি স্বর্গধামে ঢুকে পড়ছে।'

রবার্ট—'সেটা কি রকম?'

বিজ্ঞানী—'ওদের জাতীয় স্বভাব হচ্ছে জলপান খাওয়ার পয়সা দিয়ে কার্যসিদ্ধি করা। ওদের দেশে নাকি রাষ্ট্রীয় খেতাব, সাহিত্য সংস্কৃতি পুরস্কার, চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণ ময়ূর পাওয়া থেকে শুরু করে নার্সারী স্কুলে শিশুকে ভর্তি করা, রেলের রিজার্ভেশন, সিনেমার টিকিট, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, রান্নার গ্যাস, হাসপাতালের ওষুধ, রেশনে বরাদ্দের চেয়ে বেশী চিনি ও কেরোসিন, ব্যাঙ্কের লোন, সরকারী কণ্ট্রাক্ট, বিদেশী দ্রব্য আমদানীর লাইসেন্স প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ঐ জলপান আদানপ্রদানের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই স্বর্গে আসার জন্যও ওদের সোজা ও সৎ পথ অবলম্বন করার দরকার হয় না। যেসব যমদূত ওদের আনতে যায় তাদের হাতে কিছু জলপান গুঁজে দেয় এবং

যমদূতরা ওদের নরকে না নিয়ে সোজা এই অমৃতধামে পেঁছে দেয়।'

রবার্ট—'তাহলে আপনি এখন কি করবেন, স্যার?'

বিজ্ঞানী—'কি আর করবো। এবার থেকে ফোনের রিং ক্রিং ক্রিং করলেই আমি রিসিভার তুলে ওদের গলায় শোনা একটা গানের কলি গেয়ে উঠবো—

"দোষ কারো নয় গো মা,
আমি সখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা,
তারের জালেতে জড়িয়ে তারা মা,
মীনের মত ছেঁকে তুলে উমা,
শিবের পাতেতে ভেজে দিয়ে বামা,
স্বর্গভয় দূর কর গো আমার।"

দৌড় দৌড় দৌড়

রমেন স্যার হন্তদন্ত হয়ে ক্লাসে ঢুকলেন। নাম ডাকার তেলচিটে লম্বা বাঁধানো খাতাখানা সামনের ছোট টেবিলটার উপরে রেখে চেয়ারে বসার আগেই বলতে শুরু করলেন,—'শোন, খবর আছে। আচ্ছা বল তো, ২৬শে জানুয়ারী কিসের জন্য বিখ্যাত?'

দেবু ক্লাসের ফার্স্ট বয়—আধময়লা কলার ছেঁড়া সাদা সার্ট ও রঙচটা নেভি ব্লু হাফ-প্যান্ট পরনে। পায়ের হাওয়াই চপ্পলটা খয়ে খয়ে ছিঁড়ে যাওয়ায় খালি পায়েই স্কুলে এসেছে। সামনের বেঞ্চে বসে এতক্ষণ সে কাগজ ভাঁজ করে উড়ো জাহাজ বানাচ্ছিল। স্যারের প্রশ্ন শুনে সে তরাক্ করে উঠে দাঁড়িয়ে জবাব দিল—'আজ্ঞে, কমলালেবু দিবস, সার।'

—'আরে গর্দভ, এটাও জানিস না যে ···।' রমেন স্যারের কথা শেষ হওয়ার আগেই পাশ থেকে শিবু উঠে দাঁড়িয়ে দেবুকে সমর্থন করে বললো—'হাঁ সার, ঐ দিন গেল বছর আমাগো কমলালেবু দিছিল। কিন্তু আমার ডা পচা বাড়াইছিল, সার। দেবু তখন ওর থিক্কা চার কোয়া আমায় দিল।'

—'হা রে হতভাগার দল!' রমেন স্যার কপালে হাত রেখে আক্ষেপের সঙ্গে বললেন,—'এই যে আমাদের দেশের নেতারা ইংরেজদের হাত থেকে আমাদের দেশটাকে উদ্ধার করলেন, তারপর প্রজাদের উদ্দেশ্যে দেশকে উৎসর্গ করলেন এসব কোন খবর জানিস না। তোরা এদেশের সন্তান নাকি?'

শিবুর বড় তর্ক করা স্বভাব। ওর জন্ম ভারতবর্ষে হলেও কথায় ওপার বাংলার টান সুস্পষ্ট। সেই টান দিয়ে শিবু আবার উত্তর দিল—'সার, মা কয় এই ডা আমাগো দ্যাশ না। আমাগো দ্যাশ ছিল পূর্ব্ববঙ্গে, ফরিদপুর জিলায়।' রমেন স্যারের গলার স্বর এবার বিরক্তিতে একটু কড়া হল—'সেটা তোর দেশ ছিল না

রে হনুমান, ওটা ছিল তোব বাপ ঠাকুরদার দেশ। তোর দেশ এই ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের জন্য তোদের সকলকে এবার দৌড়াতে হবে।' ছাত্ররা সকলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো—'দৌড়াতে হবে, কেন সার?'

--'না দৌড়ালে দেশটাকে আগে বাড়াবি কেমন করে! দৌড়ে দৌড়ে আগে নিয়ে যেতে হবে দেশকে। তোরা যত দৌড়াবি ততই না দেশও আগে আগে ছুটবে।' রমেন স্যারের মুখে স্মিত হাসি। কিন্তু ফার্স্ট বয় দেবুর ধারণা পরিষ্কার হল না। সে তাই ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করলো -'সে কি করে সম্ভব হয়, সার?' শিবুর সঙ্গে চোখাচোখি করে ঠোঁট ভ্যাটকাল দেবু। রমেন স্যার এবার উদাহরণ দিয়ে ভাল করে বোঝাতে চাইলেন—'কেন দেখিস না, যখন রেলগাড়ীতে করে আমরা ছুটে চলতে থাকি তখন পাশের বাড়ীঘর গাছপালা, ধানক্ষেত, টেলিগ্রাফের পোস্ট সব কেমন আমাদের গাড়ীর সঙ্গে দৌড়তে থাকে?' কয়েকজন ছেলে আবার একসঙ্গে বলে উঠলো--'আমরা আজও রেলগাড়ীতে চড়ি নাই সার।' রমেন স্যারের চোখ গোল গোল বিস্ফারিত হয়ে গেল—'বলিস কি রে? তোরা এখনও রেলগাড়ীতে চড়িসনি। আমরা যে আর ক'দিন পরেই একবিংশ শতাব্দীতে পেঁৗছে যাব—তোরা তখন কোথায় থাকবি?'

উত্তর দিল দেবু -'আমরা এই গাঁয়েই থাকব, যাব আর কোথায়। আমরা যতই দৌড়াই আমাদের গাঁ কি আর শহরে পেঁৗছাইতে পারবে?' রমেন স্যারের মুখে চট করে উত্তর এল না। জানলা দিয়ে বাইরে সবুজ ধানক্ষেতের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। সেই অবসরে শিবু আবার উঠে দাঁড়ায়—'আমি দৌড়াইতে পারুম না, সার। আমার ভ্যাজাল তেল খাইয়া পা অবশ হয়া গিছিল, আজও পায়ে তেমন বল পাই না।'

--'কেন গত বছর যে কমলালেবু খেলি তাতেও শরীর ভাল হল না। ঐ কমলার রসে যা বল দিয়েছে তাতেই যথেষ্ট দৌড়ান যাবে।'

খিঁচিয়ে উঠলেন রমেন স্যার।—'কইলাম তো আমার ডা পচা ছিল—রস খাইলাম কই?' আরও কয়েকটি ছেলে বলতে লাগলো—"ঠিক কথা সার, আমাদেরটাও পচা ছিল, শুঁটকো রস নাই, বাবা বলছিল যে সব ঠাণ্ডা ঘরে রাখা লেবু তোদের দিছে, রস পাবি ক্যামনে?'

গম্ভীর স্বরে রমেন স্যার ধমকে উঠলেন—'শোন, লেবুতে রস ছিল কি ছিল না সেটা বড় কথা নয়। তোমরা কমলা লেবুর মত ফলের আস্বাদ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছো এটাই যথেষ্ট। জান, পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা ঐ কমলালেবুর মত। এখন তোমরা যদি না দৌড়াও তবে তোমাদের দেশের অবস্থাও ঐ ঠাণ্ডা ঘরে রাখা লেবুর মত শুঁটকো হয়ে যাবে। তোমাদের দৌড়াতে হবে। তোমরা দৌড়ালে তবেই না তাতে রস সঞ্চার হবে।'

ফার্স্ট বয় দেবু গোমড়া মুখ করে জিজ্ঞেস করলো—'সেই রস খাবে কে?'

—'কে খাবে না খাবে তা নিয়ে তোমাদের মাথা ব্যথা কেন? তোমরা তোমাদের দেশের জন্য দৌড়াচ্ছ এটাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি তোমাদের কোন কর্তব্য নাই?' প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লেন রমেন স্যার। কিন্তু দেবুও হঠাৎ যেন কোথা থেকে দুঃসাহস পেয়ে গেল। রমেন স্যারের চোখে চোখ রেখে সে বললো—'দেশ আমাদের কি দেয়। আমাদের গাঁয়ে হাসপাতাল নাই, রাস্তা নাই, লাইট হয় নাই, জলের কষ্ট এসব কে দ্যাখে? গেল বছরের আগের বছর ঝড়ে আমাদের ইস্কুলের টিনের চাল উড়ে গেল, আজও তা হইল না, বৃষ্টির সময় জল পড়ে বলে ক্লাস হয় না। আমাদের দৌড়াইয়া কি লাভ?'

—'শোন দেবু, এই সপ্তম শ্রেণী থেকেই তুমি যে রাজনীতির বুলি ঝাড়তে শুরু করেছো, এর ফল একদম ভাল হবে না। পুলিশের খাতায় নাম উঠে যাবে। তোমরা বড় সুবিধাবাদী, কি পাওনি সেটা বড় করে দেখ আর যা পাও তা তো স্বীকার কর না।

তোমরা যে আজও না মরে বেঁচে আছ এটাই কি দেশের মহান অবদান নয়?' আবেগে রমেন স্যারের গলা বুজে আসে—দেশ ভক্তিতে মুখ আর্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু শিবু একটু ফচকে—পেছন থেকে টিপ্পনি কাটে—'না খাইয়া, ভ্যাজাল খাইয়া কতদিন আর বাঁচুম আমরা। ঘরে তো ছয় মাসেরও খাবার ধান থাকে না'।

—'তা তোমাদের বাপ মা গাদা গাদা বাচ্চা পয়দা করতে থাকবে আর দেশ তোমাদের ঘাড়ে করে নাচতেই থাকবে? এত লোকের খাবার আসবে কোথা থেকে?' রমেন স্যারের আর ভদ্রতার আড়াল রাখা সম্ভব হল না। শিবুও তর্কে হারার পাত্র নয় সে বলে ওঠে, —'আমরা ভাইবোন কম হইলে দৌড়াইবার লোকও যে কম হইয়া যাইব, সার।' হো হো হাসিতে ফেটে পড়লো সমস্ত ক্লাস। শিবু না দমে বলতেই থাকলো—'সার, গত মাসে কলকাতায় মিটিঙের জন্য যখন বাসে কইরা গাঁয়ের লোক নিতে আইছিল তখন সেই দাদারা বলতিছিল আরো লোক জোগার কর। ভিড় কম হলি চলবে না—বিশাল সমাবেশ করতে হবে। ভিড় চাই ভিড়।'

এবার রমেন স্যার সত্যি একেবারে চুপসে গেলেন যেন। মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন—'ঠিকই বলেছিস, তোদেরও ঐ ২৬শে জানুয়ারী দৌড়ানর সময় ভিড় কম হলে চলবে না। তোরা সব ভাইবোনদের সঙ্গে নিয়ে আসিস। এবার সেক্রেটারী মশায়ের ছেলে দৌড়ের ছবি তুলে খবরের কাগজে ছাপাবে। জানিস তো, এবার পঞ্চায়েত ইলেকসনে সেক্রেটারী মশায় দাঁড়াবেন। তোদের দৌড়ের ছবি দেখিয়েই তো উনি তোদের গাঁ'কে আগে বাড়ানোর আশ্বাস দিয়ে বক্তৃতা দেবেন। ভিড় কম হলে কিন্তু মুশকিল হবে। তোরা সবাই আসবি—সব ভাইবোনকে নিয়ে আসবি। এবার তোদের মুরগীর ডিম সিদ্ধ দেওয়া হবে।'

দৌড়ের দিন সকাল থেকে কিলবিল করতে করতে ছেলেমেয়েরা সব জমা হতে লাগল স্কুলের মাঠে। অফিস ঘরের সামনে মস্ত বড় গামলায় ডিম সিদ্ধ রাখা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা সকলেই একবার

করে ঘুরে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। না, রমেন স্যার মিথ্যা কথা বলেননি। দৌড়ানর উৎসাহ বেড়ে গেল সকলের। একটা জীপে চড়ে সেক্রেটারী মশায়ও এসে গেলেন স্কুলের মাঠে—সঙ্গে ভোটের লোকজন। তার ছেলে গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে আর ছবি তুলছে ক্লিক ক্লিক করে। শিবু দেবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো, —'নিজেরা ক্যামন গাড়ী চইড়া বেড়ায় দেখেছিস। দৌড়ের বেলায় আমরা আর উনারা খালি রস খাওনের দাবীদার।' দেবু মুখে আঙ্গুল তুলে শিবুকে চুপ করতে ইশারা করলো। কিন্তু তারপর খুব আস্তে ফোরণ কেটে বললো, 'উনারা খালি রস খান না, শাঁসটুকুও খান। আমরা দৌড়াইলে ফলন ভাল হবে যে।' ঠিক বেলা দশটায় অনুষ্ঠান শুরু হল। প্রথমে হেড স্যার বক্তৃতা করলেন। সেক্রেটারী মশায়ের দেশ সেবার কথা বলতে বলতে হেডস্যারের গলা আবেগে বুজে আসছিল। এরপর সেক্রেটারী মশায় বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা পতাকা উত্তোলন করলেন। হেড স্যার সেক্রেটারী মশায়কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। সেক্রেটারী মশায় মুখে হাসি মাখিয়ে বলতে শুরু করলেন —"প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তোমাদের হাতেই দেশের ভার। আজ যে দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে তার মধ্যেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে। পঞ্চায়েত হচ্ছে দেশ সেবা করার প্রথম সিঁড়ি। পঞ্চায়েতের পরেই বিধানসভা আর তার পরেই সংসদ। তোমরা জোর কদমে দৌড়াইয়া দেখাইয়া দাও যে আমরা পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা এবং বিধানসভা থেকে সংসদে কেমন ছুটিয়া আগাইয়া যাইতেছি। তোমরা বেদ উপনিষদের কথা শুনেছো — আমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। তাতেও লেখা আছে চরৈবেতি চরৈবেতি —অর্থাৎ উঁচাতে চড়, উপরে উঠ। তোমরা এইভাবেই ছুটিয়া এবং ছোটাইয়া দেশকে উন্নত কর।" সবার আগে হেড স্যারই দুই হাত উপরে তুলে হাততালি দিতে শুরু করলেন। দেবু শিবুরা

জানে না যে হেড স্যার জমি কেনার জন্য যে লোনের দরখাস্ত করেছেন সেক্রেটারী মশায় তা ফরওয়ার্ড করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

রমেন স্যার মুখে একটা টিনের হুইসেল বাজাতে বাজাতে ছেলে-মেয়েদের মাঠে নিয়ে গেলেন। সেক্রেটারী মশায় সবুজ পতাকা দেখিয়ে দৌড় শুরু করালেন। কালো সরু লিকলিকে পাগুলো মেঠো পথের ধুলোর উপর ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে—ধুলো উড়ছে আকাশে। মনে হচ্ছে, যেন কোন ধুনুরি তুলো ধুনে চলেছে ঝিনঝিন আওয়াজ তুলে। শিবু ওর কমজোর পা নিয়ে ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়ছে, রোদে ধুলোয় চোখ অন্ধকার। সকালে কটা শুকনো মুড়ি খেয়ে এসেছে মাত্র। কমজোর পা আরও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে যেন। তবু ডিম সিদ্ধ খাওয়ার লোভে সে আপ্রাণ দৌড়ানোর চেষ্টা করছে। জানুয়ারী মাসেও তার কপালে ঘাম জমে উঠছে—শিবু সবার পিছনে ছুটছে। হঠাৎ সেই ধুলোর আস্তরণ ভেদ করে একটা ছবি ফুটে উঠলো ওর চোখের সামনে। পঞ্চায়েত অফিসের দেওয়ালে আঁকা একটা পোস্টার—তাতে তিনরঙ্গা একটা ঢেউ খেলানো ফিতের মধ্যে টুপি পরা একটা মুখের ছবি। ঐ দেশ নেতারাই নাকি ভারতবর্ষকে উদ্ধার করে প্রজাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। আর সেই টুপি পরা মুখটা যেন বলছে,—"বেটে, জোর কদমসে দৌড়ানা। ইয়ে দেশ তো তুমহারা হ্যায়—ইসে আগে বাড়াও। দৌড় বেটে, অউর তুরন্ত দৌড়ানা।" কিন্তু শিবুর চোখ বুজে আসতে লাগলো—কপাল বেয়ে ঘাম নামতে শুরু করেছে। না, আর পারছে না,—ধপাস করে রাস্তায় শুয়ে পড়লো শিবু। আর ঠিক তখনই সে দেখতে পেল যেন গামলায় রাখা শত শত ডিম সিদ্ধ ফুটে মুরগীর ছানারা বেরিয়ে রাস্তায় ভিড় করে দৌড়তে শুরু করেছে।

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

রসিকজনেরা বলেন, আইন নাকি কতকটা মাছ ধরা জালের মত। পাকা রাঘব বোয়ালরা সেই জালে সহজে ধরা পড়ে না, ছোট চুনো পুঁটিরাও অনায়াসে ফাঁস গলে বেরিয়ে যায়, শুধু বোকা মাঝারি মাছগুলোই জালে আটকা পড়ে বেশি। আসলে মধ্যম বর্গরা সর্বত্রই সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির জাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়। তারা না পারে আইনের জাল এড়াতে, না পারে ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে। তাই আইনের প্যাঁচে জড়িয়ে মরে তারাই সবার চেয়ে বেশী।

কোন এক বিচারককে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সাধারণ বিচার ব্যবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় প্রকৃত অপরাধীর সাজা হয় না। অন্যায়, দুর্নীতি, অত্যাচার করেও আইনের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি খালাস হয়ে যায়। এর কারণ কী? উত্তরে তিনি বলেন, বিচারকরা ন্যায় বা অন্যায়ের বিচার করেন না —শুধু আইনের বিচার করাই তাঁদের কাজ। অর্থাৎ আইন মোতাবেক অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কিনা সেটুকুই বিচার্য। এমন কি আইনের যথার্থতা বিচার করার ক্ষমতাও তাঁদের নেই। যদি না আইনটি নেহাতই সংবিধানকে লঙ্ঘন করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে শুধুমাত্র কোন আইনের আঙ্গিক অথবা বৈধতা বিচার করতে পারেন—অর্থাৎ আইনটি সঠিক ও বৈধ পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে কি না। সাধারণত দেখা যায় —সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ যাদের হাতে, আইন তাদের ইচ্ছেরই প্রতিফলন মাত্র। বলা হয় যে বুদ্ধি, বিত্ত ও বিলম্ব করার অবকাশ থাকলে আইনকে অনায়াসেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো যায়। বুদ্ধির জোরে চোরাকারবারে ভেজালদার বা কালোবাজারিরা আইনকে কলা

দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিত্তের জোরে স্ত্রীহন্তা সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে বাস করছে অথবা শুধুমাত্র সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে বধূহন্তা ফাঁসির দড়ি এড়িয়ে গেছে, এমন নজির রয়েছে আমাদের চারপাশে। কীভাবে এবং কেন এরা আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়?

দার্জিলিং জেলার এক বিখ্যাত চা বাগান থেকে কলকাতার এক নামী কোম্পানি কয়েক লক্ষ টাকার চা কেনার চুক্তি করে। নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা চা বাগানে গেলেন। তাঁদের সামনে চা পাতার গুণাগুণ পরীক্ষা করা হল এবং ওজন করে কাঠের পেটিতে ভর্তি করা হল। এরপর চায়ের বাক্সগুলি ঐ বাগানেরই ট্যাক্টরে করে পাঠানো হল। ট্যাক্টরটা পাহাড়ি সহজ পথ ধরে রওনা হল সময় বাঁচানোর জন্য এবং কোম্পানির লোকজন হিলকার্ট রোড দিয়ে এলেন মোটরে করে। শিলিগুড়িতে পেঁছে একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির ট্রাকে করে চায়ের পেটিগুলি পাঠানো হল কলকাতার উদ্দেশ্যে। তারপর সেই কর্মচারীরাও রাত্রের ট্রেনে কলকাতায় রওনা হলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড কলকাতায় মাল ডেলিভারি নেবার পর সেই কাঠের পেটিগুলি খুলে দেখা গেল চা পাতার বদলে সেগুলি ভর্তি রয়েছে মাটিতে—শুধুই মাটি। অনিবার্য কারণেই মামলা দায়ের হল চা বাগিচার মালিকের বিরুদ্ধে। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চতর আদালতে মামলা গড়ালো কয়েক বছর। উভয় পক্ষই যথেষ্ট বিত্তশালী। বুদ্ধি জোগানোর জন্য উভয় পক্ষই নিযুক্ত করল বড় বড় সব আইনজীবীদের। কিন্তু না—চা বাগানের মালিক বেকসুর খালাস হয়ে গেলেন। প্রথমত, আইনের চোখে প্রমাণ হয়নি কু-কর্মটি প্রকৃতপক্ষে কারা কীভাবে করেছে—চা বাগিচার মালিক, না ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি। দ্বিতীয়ত, আইনগত পদ্ধতিতেও ছিল কিছু ত্রুটি। ক্রেতা কোম্পানি শুধুমাত্র চা বাগানের মালিকের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেছিল, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিটিকেও একই সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়নি। এক্ষেত্রে

ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিটির ভূমিকা সম্বন্ধেও তাই সন্দেহের অবকাশ ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, যারা চায়ের পেটি বদলে মাটির পেটি গাড়িতে তুলে দিয়েছিল, এমন কয়েকজন পাহাড়ি কুলি পুলিশের এবং আইনজীবীদের জেরার মুখে সমস্ত ঘটনাটি স্বীকার করেছিল। কিন্তু তাদের স্বীকৃতি আইনগ্রাহ্য হয়নি। বিচারের রায়ে বলা হয়েছিল, যারা টাকার লোভে একবার এতবড় অপরাধ করেছে তারা যে আবার টাকা নিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিচ্ছে না একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। আইনের ভাষায় ঐ সাক্ষীরাও 'কো-অ্যাকমপ্লিস' বা সহ-অপরাধী। ঐ সাক্ষীদের স্বীকৃতি তাই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। সুতরাং মামলা বাতিল।

কোন এক আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অঝোরে কাঁদছিল গায়ের বৌ রুক্মিণী আর বলছিল, 'খালি বড়লোকদেরই বিচার হয়, গরিবের কথা কেউ শোনে না।' রুক্মিণীর বিয়ে হয়েছিল বার বছর বয়সে, তার বরের বয়স তখন আঠার বা উনিশ। কিন্তু বিয়ের পর দেনা-পাওনার গণ্ডগোল নিয়ে রুক্মিণীকে তার শ্বশুর ঘরে নেয়নি। পরে খোঁজখবর করে জানা যায়, রুক্মিণীর স্বামীটিও ঘর ছেড়ে কোথায় পালিয়ে গেছে। প্রায় আট দশ বছর এভাবেই কেটে গেল। এদিকে ভরা যৌবনা রুক্মিণীর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল গাঁয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষকের। দু'জনের আবার বিয়েও হল। অভিভাবকরা বা গাঁয়ের লোকজন সেই বিয়েতে তেমন আপত্তিও করেনি। সুখেই ঘর করছিল রুক্মিণী। দুটি ছেলেও হয়েছিল তাদের। হঠাৎ বছর পনের বাদে রুক্মিণীর প্রথম স্বামীটি এসে হাজির। খামখেয়ালী লোকটি রুক্মিণীর সুখ দেখে মোটেই সুখী হতে পারল না। বরং ঈর্ষায় জ্বলে তাকে জব্দ করার জন্য উঠে-পড়ে লাগল। মামলা রুজু করল জেলা আদালতে। রুক্মিণীর দ্বিতীয় স্বামীটি আইনজীবীর পরামর্শে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে গিয়ে তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রিও করে এল। কিন্তু আদালত তো ন্যায় অন্যায়ের বিচার করে না, করে আইনের বিচার। গাঁয়ের

মেয়ে রুক্মিণী যে না জেনে হলেও আইন অমান্য করেছিল, প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ না করেই দ্বিতীয় বিয়ে করেছিল। সুতরাং তার দ্বিতীয় বিয়েটা আইনত অসিদ্ধ, যতই সুখে থাক না কেন সে। আর তার দ্বিতীয় স্বামীর ছেলে দুটি? যেহেতু রুক্মিণীর প্রথম বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি, তাই ছেলে দুটির পিতৃত্বের অধিকারও তার প্রথম স্বামীর। রায় শুনে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল রুক্মিণী। কিন্তু তার চোখের জলে তো আইনের প্যাঁচ কাটতে পারে না। অবশ্য পরে শোনা গিয়েছিল যে রুক্মিণীর গাঁয়ের লোকজন টাকাপয়সা দিয়ে তার প্রথম স্বামীটির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিয়েছিল।

আমাদের কাজের বৌ লক্ষ্মীর মায়ের কথা শুনে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। সে বলল, 'ওসব জানিনা কো, দিদিমণি। আমাদের গাঁয়ের আইন আলাদা।' আমি যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি যে আইন কোন গাঁয়ের জন্য আলাদা হতে পারে না, আইন সবার জন্য এক, সব জায়গায় একই আইন চলে। কিন্তু সে তা মানতে রাজি নয়। শহরের আইন ও গাঁয়ের আইন কখনও এক হতে পারে? আসলে সে তার মেয়ে লক্ষ্মীকে এবার দেশে নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিয়ে এসেছে। লক্ষ্মীর বয়স বার কি তের হবে। আমি বললাম, 'জাননা মেয়েদের আঠার বছরের আগে বিয়ে দেওয়া বেআইনি?' লক্ষ্মীর মা জবাবে বলল, 'মেয়েটার যদি কিছু হয়ে যায় তখন কোন আইন তাকে সাহায্য করবে কি'? শুধু বাল্যবিবাহ নয়, বহুবিবাহও লক্ষ্মীর মায়ের গ্রামে নাকি আকছার হয়। সে নিজেও তার স্বামীর চতুর্থ স্ত্রী এবং তার একজন সতীন এখনও বর্তমান। গাঁয়ের অধিকাংশ লোকেরই এমন দু' তিনটে স্ত্রী আছে।

আশ্চর্য, সে গ্রাম কিন্তু কলকাতা শহর থেকে খুব দূরে নয়— মেদিনীপুর জেলার এক গ্রাম। এক বিয়ে থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে করা আইনত অপরাধ, এটা গ্রামের লোকেরা যে জানে না এমন

নয়। কিন্তু বহুবিবাহ করা ঐসব বীরপুরুষরা কেউ আইনের জালে ধরা পড়ে না। কারণ হিন্দু বিবাহ আইনে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের ক্ষেত্রে এক স্ত্রী অথবা স্বামী বর্তমান থাকতে কোন পুরুষ বা মহিলা দ্বিতীয় বিয়ে করলে ভারতীয় পেনাল কোডের ৪৯৪ ধারা অনুসারে তার সাত বছর কারাদণ্ড হতে পারে। সরকারী চাকুরে পুরুষ বা মহিলার ক্ষেত্রে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথা ঐ অপরাধীদের আইনের জালে ধরবে কে? পুলিশ বিনা ওয়ারেণ্টে এ ধরনের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে পারে না। একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত স্ত্রী অথবা স্বামী বা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন আদালতে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে পারে। মজা এই যে, লক্ষ্মীর মায়ের মত গাঁয়ের যে মহিলাদের পরের বাড়ীতে গতরে খেটে অন্ন সংস্থান করতে হয় তারা আদালতের আশ্রয়ে যায় কী করে? ফলে এরকম বহু গাঁয়েই বহু পুরুষ নির্ভয়ে একাধিক বিয়ে করে যাচ্ছে এখনও। হিন্দু বিবাহ আইন গাঁয়ের আইনকে ছুঁতেও পারে না।

আইনকে কলা দেখানোর ব্যাপারে নিম্নবিত্তরাও যে কত সাহসী হয়ে উঠেছে তার এক ঘটনা শুনলে চমকে উঠতে হয়। কলকাতার কিছু দূরে শহরতলিতে থাকেন এক ভদ্রলোক। সরকারি অফিসে চতুর্থ শ্রেণীর কাজ করতেন। কিন্তু অবস্থা বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। পাকা বাড়ী হয়েছে, কয়েক বিঘে ধানের জমিও করেছেন, বাড়ীতে গরু-মুরগি আছে। চার ছেলেকেও সরকারি বা আধা সরকারি অফিসে কাজে ঢোকাতে পেরেছেন, দুই মেয়ের ভাল বিয়েও দিয়েছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রীর বেশ গিন্নিবান্নি গোছের চেহারা, গলায় বিছে হার, হাতে শাঁখার পাশে চুড়ি, বালা। অবস্থা দেখে মনেই হয় না, ভদ্রলোক চতুর্থ শ্রেণীর চাকরি করতেন। কথায় কথায় মহিলা বললেন,—তাঁর বড় ছেলে, সেজ ছেলে ও ছোট ছেলের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু মেজ ছেলের বিয়ে হয়নি এখনো।—'কেন?' মহিলা বললেন,—'মেজ ছেলের চাকরি কিনাতি হল কি না, অনেক

টাকা খরচ হল।' সেকি চাকরি কেনা, সে আবার কী? ব্যাপারটা পরিষ্কার হল কথায় কথায়। চার ছেলের মধ্যে সেজ ছেলেই মাধ্যমিক পাশ করেছিল এবং স্বাভাবিক কারণেই একটু ভাল চাকরির চেষ্টায় ছিল। খবর পাওয়া গেল সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার এক পরিচিত ব্যক্তি কিছুদিনের মধ্যেই অবসর নেবেন। কয়েক বছর আগে স্বেচ্ছায় অবসর নিলে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির সন্তান, জামাই অথবা কোন নিকট আত্মীয়কে সেই জায়গায় চাকরি দেবার বিষয়ে একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। মেজ ছেলেটি ও তার বাবা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে উক্ত ভদ্রলোক মেজ ছেলেটিকে জামাই হিসেবে দেখিয়ে চাকরিটা পাইয়ে দেন। জামাই প্রমাণ করার জন্য ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে মেজ ছেলের একটা রেজিস্ট্রি বিয়েও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গণ্ডগোল বাধল অন্য জায়গায়। অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি জাতিতে ব্রাহ্মণ আর ছেলেটি তপসিলি জাতি। ত্রিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ছেলেটিকে চাকরিটি পাইয়ে দিয়েছেন বটে, তা বলে ব্রাহ্মণের মেয়েকে ছোট জাতের হাতে তুলে দিতে পারেন না। বিয়েটা নেহাতই লোক দেখানো। এখন উচ্চবর্ণের পিতা নিম্নবর্ণের জামাইকে স্বীকার করতে রাজি নন। অবসর নিয়ে তিনি অন্যত্র চলে যান। শোনা গেছে, মেয়ের অন্য জায়গায় আবার বিয়েও দিয়েছেন। ছেলের মা বললেন, 'মেজ ছেলের একটু চুপচাপ করি বিয়ি দিতি হবে তো। তারই খোঁজ খবর হতিছে।' হায় রে হিন্দু বিবাহ আইন!

বাড়ী ভাড়া বা ভাড়াটে আইনের জালের ছেঁদাগুলো আবার এতই বড় যে আজকাল বাড়ীওয়ালা ও ভাড়াটেদের মধ্যে প্রায় আইনের ক্যারাটে খেলা শুরু হয়ে গেছে বলা যায়। ভাড়াটে যদি বিত্ত বা বুদ্ধির অধিকারী হন তবে বাড়ীওলাকে কুপোকাত করতে তাঁকে বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। কলকাতার অভিজাত পাড়ায় এক অভিজাত বাড়ির ফ্ল্যাটে ভাড়া ছিলেন পশ্চিম ভারতের একজন ব্যবসায়ী। নানা কারণে তাঁকে কলকাতা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে

নিজের প্রদেশে চলে যেতে হয়। কিন্তু যাবার আগে ঐ ব্যবসায়ীটি একটা শেষ দাঁও মেরে যেতে চাইলেন। কাগজে বেনামে বিজ্ঞাপন দিলেন ফ্ল্যাটটি ভাড়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করে। বিজ্ঞাপন দেখে ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেবার জন্য উৎসাহী হলেন এক বাঙালী ডাক্তার। কিন্তু বাড়ীওয়ালার অজ্ঞাতে সাবলেট করা অর্থাৎ অন্যকে ভাড়া দেওয়া তো আইনত অপরাধ। কে সেই অপরাধের খবর রাখে? বেশ ভাড়ী সেলামী দিয়ে ডাক্তার ভদ্রলোক ব্যবসায়ীটির কাছ থেকে ফ্ল্যাটটি অধিকার করলেন। তবে এখানে সেই ফ্ল্যাটটি সাবলেট করা হয়নি মোটেই। কাগজে-পত্রে দেখানো হল যে ব্যবসার অন্যতম অংশীদার হিসেবে ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ডাক্তারকে ঐ ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছেন। ডাক্তার দিব্যি সেখানে এক ল্যাবরেটরি করে ব্যবসা করতে লাগলেন। বাড়ীওয়ালা যদি মামলাও করেন তবে সে মামলা ছোট আদালত থেকে উচ্চতম আদালত পর্যন্ত ঘুরতে অন্তত পনের বিশ বছর সময় তো লাগবেই। সেই বিলম্বের খেলায় শেষপর্যন্ত কে জিতবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ততদিন ফ্ল্যাটটি ভোগদখল করতে তো আর বাধা নেই। তারপর ভবিষ্যতে কী হয় দেখা যাবে। এমন যে কত বাড়ী ও ফ্ল্যাট বেনামে হাত বদল হয়ে যাচ্ছে কতবার তার হিসেব কেউ জানে না।

প্রাইভেট গাড়ী চালানোর জন্য ড্রাইভারের চাকরীর ইণ্টারভিউ দিতে এল একজন ভিন-প্রদেশী লোক। কাজের সময়, মাইনে-পত্র ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তা ঠিক হওয়ার পর লোকটি বলল যে তাকে রোজ সকাল ৯টার মধ্যে একবার অফিসে গিয়ে সই করে আসার সময় দিতে হবে। গাড়ীর মালিক বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'তুমি কোন অফিসে চাকরি কর বুঝি? তাহলে এখানে তুমি কাজ করবে কি করে?' লোকটি অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে জবাব দিল, সে জন্য কোন অসুবিধা হবে না। সে নাকি এভাবে দশ বছর ধরে গাড়ী চালাচ্ছে। মালিক আবার প্রশ্ন করেন, 'কী চাকরি কর তুমি?'

'আঁজ্ঞে দারোয়ানের চাকরি।'

'তাহলে আবার প্রাইভেট গাড়ী চালাও কী করে?'

লোকটি সলজ্জ হেসে উত্তর দিল, 'আমি সকালে সই করে চলে আসি আর আমার বড় ছেলে গেটে দারোয়ানের কাজ করে।'

'বাঃ, তা কোন অফিসে চাকরী কর তুমি?'

ড্রাইভারটি এবার গর্বের সঙ্গে বললো, 'আজ্ঞে হাইকোর্টে।'

গাড়ির মালিকের চোখ গোল হয়ে গেল। এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা!

'বৈতরণী বার্তা' খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বিদ্যাসাগর উদ্বিগ্ন মুখে এসে ঢুকলেন রামমোহনের কক্ষে। রামমোহন তখন জামবাটী ভর্তি রাবড়ি, রুপোর রেকাবীতে গুটিকয় বড় সন্দেশ ও বড় একটি স্ফটিকের গ্লাসে ঘোলের সরবৎ নিয়ে জলযোগ সমাধা করছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি নাকি সারাদিনে প্রায় বার সের দুগ্ধজাত খাদ্য সেবন করতেন। এমন কি বিলেতে যাওয়ার সময়েও তিনি জাহাজে করে কয়েকটি মুলতানী গরু নিয়ে গিয়েছিলেন। পরপারেও তাঁর সেই অভ্যাস পরিবর্তিত হয়নি। প্রথমতঃ স্বর্গে তো দুধের মাদার ডেয়ারী নাই, সেখানে কল্পতরু গাভী পর্যাপ্ত দুধ সরবরাহ করে। দ্বিতীয়তঃ জীবিতকালে তিনি নানারকম সৎ কাজ ও সমাজ সংস্কার করার জন্য স্বর্গীয় রাষ্ট্র খেতাব লাভ করেছেন। স্বর্গের স্বরাষ্ট্র দপ্তর তাই তাঁকে কিছু বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়েছে এবং তাঁর খাদ্য তালিকা আগের মতই বরাদ্দ করেছে। রামমোহন মুখের সন্দেশটি গলাধঃকরণ করে বললেন, —'কি সংবাদ ওহে দয়ার সাগর? প্রাতঃকালে এরূপ বিষণ্ণ বদন কেন?' বিদ্যাসাগর হাতের কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, —'অদ্যকার সমাচার পত্র অবলোকন করিয়াছেন কি? দেখুন কীরূপ মর্ম্মভেদী সংবাদ।' রামমোহন বিদ্যাসাগরের দেখিয়ে দেওয়া অংশের হেডলাইনে চোখ বোলালেন—

"বিদ্যালয়ের অট্টালিকা ধ্বসিয়া চত্বারিংশজন বালক-বালিকার জীবন্ত সমাধি। নিষ্পাপ শিশুদিগকে নূতন জন্ম দিবার পূর্ব্বে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিবার নির্দ্দেশ।"

দুঃখে মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল রামমোহনের। মাথা দোলাতে দোলাতে তিনি বললেন,—'আহা, বালখিল্যগুলির ভবলীলা

সম্পূর্ণ করিবার অবকাশ মিলিল না। অকালেই প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।' বিদ্যাসাগর বললেন,—'ঈদৃশ ঘটনা যারপরনাই শোকাবহ। চলুন, একবার স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিয়া আসা যাউক।' রামমোহন আহার অসমাপ্ত রেখেই উঠলেন এবং দুজনে স্বর্গের সচিবালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। প্রধান সচিব চিত্রগুপ্ত তখন সবেমাত্র তাঁর হিসাবের বিপুলাকার খাতাখানা খুলে বসেছেন। বিশিষ্ট স্বর্গবাসী দুজনকে আসতে দেখে বললেন, -'এমত পূর্বাহ্নেই এখানে আগমনের হেতু কী? না, রূপ কানোয়ারের পরে অপর কোন সতী আপাততঃ স্বর্গারোহণ করে নাই এবং বিধবার সংখ্যাও বর্তমানে অতীব সীমিত। বিধবা যাহারা আইসেন তাহারা নিতান্তই বৃদ্ধা—স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এখানে আইসেন। ভারতখণ্ডে বৈধব্য পালনের কঠোরতাও বর্তমানে শিথিল এবং প্রকৃতপক্ষে বিলীনপ্রায়। সুতরাং আপনাদিগের উদ্বেগ পোষণের আবশ্যকতা নাই।' রামমোহন সবিনয়ে বললেন, —'মহাশয়, আমি সতীদাহ নিষিদ্ধ করিবার এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রচলন করিবার নিমিত্ত আন্দোলন করিয়াছিলাম, একথা যথার্থ। কিন্তু আমরা উভয়েই আরও একটি বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করিয়াছিলাম। মেকলে সাহেবের সহায়তায় আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এ-তাবৎ তাহার কী পরিণাম হইয়াছে সে বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য অবগত হই নাই। অদ্যকার বৈতরণী বার্তায় একটি সংবাদ পাঠ করিয়া বিশেষ বিচলিত বোধ করিতেছি।' রামমোহনের কথা শেষ হওয়ার আগেই চিত্রগুপ্ত বলে উঠলেন,—'অহো, তিষ্ঠ! চত্বারিংশজ্জন বালকবালিকার অকাল প্রত্যাবর্তনের সংবাদ অবশ্যই? নন্দন শিশুবিতানে প্রস্থান করুন। প্রত্যক্ষে সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইবেন।'

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর অতএব নন্দন কাননের দিকে চললেন। দূর থেকেই তাঁরা শিশুকণ্ঠের কলকাকলি শুনতে পেলেন। কাননের পাতা বাহারের কেয়ারীর ওপরে অনেকগুলি বালকবালিকা

হুটোপুটি করে খেলা করছে। নীলমণি লতায় আচ্ছাদিত তোরণটি পার হয়ে দুজনে ভিতরে প্রবেশ করলেন। একপাশে কয়েকটি বালিকা গলায় ব্রহ্মকমল ফুলের মালা, কানে কুরুবকের দুল ও মাথায় পারিজাতের চূড়া পরে ঘুরে ঘুরে গাইছে ও নাচছে—'আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটী—ঈ-ঈ-ঈ, আহা হা হা হা···।' বৃদ্ধ দুজনকে আসতে দেখে ওরা যেন হঠাৎ সচকিত হয়ে থেমে গেল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর হাসি মুখে এগিয়ে গেলেন। ছেলেমেয়েরা সকলে তাঁদের ঘিরে দাঁড়াল। রামমোহন স্মিত মুখে জিজ্ঞেস করলেন,—'বৎসগণ। তোমাদিগের সমস্ত কুশল তো?' ছেলেমেয়েরা সমস্বরে জবাব দিল —'হ্যাঁ এ্যাঁ—।' বিদ্যাসাগর জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমাদিগের নাম, গোত্র ও গাঁই কী? কোথা হইতে আগমন করিয়াছ?' একটি মেয়ে জবাব দিল,—'আমরা ওয়েস্টবেঙ্গল থেকে এসেছি। গোত্র আর গাঁই মানে কি জানি না। আমার নাম শুচিস্মিতা।' অন্যরা সকলে এক এক করে নাম বলতে শুরু করলো—সাগরসৈকত, সুগতকিঙ্কর, বিবস্বান, প্রজ্ঞাপারমিতা, ঊর্মিমালা, সুমিলিতা, অর্চিস্মান, ব্রতাধিপ, ঋতব্রত, বাণীবন্দনা, নীলাঞ্জনা, তমোঘ্ন, সুপ্রবুদ্ধ, সায়ন্তনী, নবপুষ্পিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। রামমোহন অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন —'বাঃ বাঃ, অতীব সুন্দর সব নাম তো বালকবালিকাদিগের! মর্তের বঙ্গপ্রদেশে ইদানীংকালে সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ অনুশীলন হয়েক দেখা যায়।' অনির্বাণ উত্তর দিল.—'মোটেই না। স্যাংসক্রীটকে আজকাল ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বলা হয়, কেউ পড়ে না। শুধু যারা অন্য কোন সাবজেক্টে চান্স পায় না, তারা দু' একজন পড়ে।' বিদ্যাসাগর,—'আশ্চর্য, ঈদৃশ সমাসবদ্ধ নামকরণ তাহা হইলে কিরূপে করা হয়?' শতরূপা কলবল কলবল করে বলে উঠলো.—'নামের চলন্তিকা পাওয়া যায় যে। তাতেই এইসব নাম আছে। কেউ কেউ আবার শুনে শুনেও নাম রাখে। আমাদের ক্লাসে তো সাতজন নীলাঞ্জনা ছিল। ঐ নামটা এখন খুব চালু

তো।' রামমোহন বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—'সংস্কৃত ভাষাকে যদি মৃত ভাষা আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ভাষাতে নামকরণ করিবার এইরূপ প্রবণতা কেন?' উর্মিমালা ওদের মধ্যে বয়সে একটু বড় এবং বেশ পাকা পাকা ভাব। সে উত্তর দিল,—'আসলে কি জান? এইসব নাম রাখলে লোকে কালচার্ড মনে করে যে। অবশ্য আমাদের একটা করে ডাক নাম আছে, সেগুলো স্যাংসক্রীট নয়। যেমন আমার নাম বুবুন, ওর নাম কিটু, প্রজ্ঞার নাম তুলতুল এমনি সব নাম।' বিদ্যাসাগর বললেন,—'হ্যাঁ, এগুলি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। সর্বদা ডাকিবার পক্ষে সহজ বটে। কিন্তু বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ করে না। ব্যক্তির নাম সর্বদা অর্থবহ, শ্রুতি-মধুর ও সহজবোধ্য হওয়া আবশ্যক।' হঠাৎ পাশ থেকে ডানপিটে তমোঘ্ন বলে উঠলো,—'উঃ বাবারে, তোমরা আবার এখানেও আমাদের জ্ঞান দিতে আসবে নাকি? আমরা ওয়ার্ল্ড থেকে এখানে এসেছি এবার তাহলে হিলে চলে যাব কিন্তু।' রামমোহন তার দিকে সস্নেহে তাকিয়ে বললেন,—'বাবা সোনারা, এমত ভীত হইও না। আমরা জ্ঞান দান করিতে আসি নাই। আমাদিগের কি আর এখন শিক্ষকতা করিবার শক্তি ও বয়স রহিয়াছে?' ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো,—'কেন থাকবে না? আমাদের সব টীচাররাই তো তোমাদের মত বুড়ো ছিল। কারো কারো বাঁধানো দাঁত, চোখে কম দ্যাখেন, কেউ কেউ তো আবার কানেও কম শুনতেন।' একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো পাশ থেকে। বিদ্যাসাগরের মুখ সেই হাসির ছোঁয়ায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে তার দিকে চেয়ে সহাস্যে জিজ্ঞেস করলেন,—'ঈদৃশ পুলকোচ্ছ্বাসের কারণ কি?' নবপুষ্পিতা বললো,—'ও এত হাসছে কেন জান? আমাদের অঙ্কের দিদিমণির মাথায় না ঠিক তোমার মত টাক ছিল। পিছনে ছোট্ট সাদা বড়ির মত একটু খোঁপা। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম 'ফুলস্টপ।' কেউ কেউ আবার বলতো 'বোকা থাম'। 'ক্লাসে এসে কেবল বকুনি দিতেন।'

রত্নমালা যোগ করলো,—'ও'র দাঁত বাঁধান ছিল তো তাই সব কথা কেমন যেন মুখে বেঁধে যেত। রত্নাকে বলতেন 'ড়ত্না', শর্মিলাকে ডাকতেন 'ষর্মিলা' বলে, আর পুষ্পিতাকে তো 'ফুস্ফিতা' বলে ডাকতেন। তাইতো আমরাও ওর নাম 'ফুসফুস' করে দিয়েছিলাম —হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ !" মেয়েরা সবাই হেসে কুটিপাটি। রামমোহন ভ্রূ কুঞ্চন করে জিজ্ঞেস করলেন,—'তোমাদিগের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ এমত বয়োঃবৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছিলেন কী কারণে? নূতন প্রজন্মের শিক্ষিত যুবক যুবতীগণ কি শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করিতে আগ্রহী ছিলেন না?' বিবস্বান বললো,—'তা থাকবে না কেন। চারিদিকে যা বেকার সমস্যা, একটা চাকরী পেলে তো অনেকেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাছাড়া টিচিং তো এখন সবচেয়ে মজেদার চাকরী। বার মাসের মধ্যে ছয় মাসই প্রায় হলিডে, পে-স্কেলও খুব ভাল। তার উপর হেভি টিউশন করার স্কোপ।' রামমোহন —'তাহা হইলে?' সাগরসৈকত—'হলে কি হবে? চাকরী পাওয়া কি এতই আসান নাকি?' বিদ্যাসাগর—'কেন, বিদ্যালয়ের সংখ্যা কি অপ্রতুল হইয়াছে?' বিবস্বান—'তাও খানিকটা ট্রু। আবার পলিটিক্যাল ব্যাকিং না থাকলে কোন সার্ভিসে ঢোকাই তো মুস্কিল। তাছাড়া পোস্ট খালি হয় না।' অনির্বাণ কথার খেই ধরে বললো,—'পোস্ট খালি হবে কি করে, এখন যে টীচারদের রিটায়ার করার বয়স হয়েছে সিক্সটি ফাইভ। কারো কারো সার্টিফিকেটে আবার এজ কম করে দেওয়া থাকে। ফলে লগভগ সেভেণ্টি ইয়ার উমর পর্যন্ত বুড়ো টীচাররাই কনটিনিউ করে।' ঋতব্রত টিপ্পনি কাটলো,—'সেইজন্য ওল্ড ম্যাগডোনাল্ডরা ক্লাসে এসে ঘুমোতেন আর আমরা কমিকস পড়তাম ও খেলা করতাম।'

বিদ্যাসাগর—'হায়! বিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে বসিয়া তোমরা ক্রীড়ারত থাকিতে? জ্ঞান আহরণের অভীপ্সা বা অন্বেষা ছিল না? অথচ আমাদিগের দারিদ্র্য থাকায় আমি তৈল বর্তিকা পর্যন্ত জ্বালিতে পারিতাম না। পথিপার্শ্বের আলোকস্তম্ভের নিম্নে

বসিয়া অধ্যয়ন করিতাম।' এবার ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো,—'আমরাও তো স্থান নিতে চেয়েছিলাম। পৃথিবীর সব খবর জানতে চাইতাম। এ্যানিম্যাল ওর্য়ালড, স্পেস, স্টারস, ফরেস্ট, নদী, সমুদ্র, পাহাড় পর্বত সব বিষয়ে নলেজ রাখতে চাইতাম। গ্রীনল্যান্ডের এস্কিমো, এনটারটিকার পেঙ্গুইন, পেসিফিক ওসেনের হয়েল সব দেখতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু তাতো সম্ভব ছিল না। আমাদের যে শুধু সিলেবাস পড়তে হতো। সবার জন্য এক সিলেবাস,—শুধু মুখস্থ কর আর এগজাম দাও। তাই তো পড়তে ভাল লাগত না।' প্রজ্ঞাপারমিতা শেষ ধরে বললো,—'তাইতো আমরা মাঝে মাঝে বৈরাগী হয়ে যেতাম।' বিদ্যাসাগর যেন চমকে উঠলেন, —'বৈরাগী হইয়া যাইতে? জীবনের ঊষাকালে তোমাদিগের অন্তরে এমত বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল কি কারণে? এতাদৃশ হতাশাব্যঞ্জক অনুভূতি তো শুভ লক্ষণ সংযুক্ত নহে।' বিদ্যাসাগর কই মাছের মত মাথাটা ঘন ঘন দোলাতে লাগলেন। সুর্মিলিতা তাঁকে আশ্বস্ত করার সুরে বললো, 'ঠিক তা নয়। আসলে বই দেখলেই আমাদের রাগ হয়ে যেত।' রামমোহন বললেন, 'বালকবালিকাগণ! বিদ্যার্জন করিতে হইলে পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা যে আবশ্যক। পুস্তক যে বিদ্যার আধার। পুস্তক ব্যতীত জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ হয়েক না।' ব্রতাধিপ,—'কিন্তু যা পড়তে ভাল লাগে না তা পড়তে হবে কেন? আমি তো কমিকস পড়তে খুব ভালবাসতাম। কমিকস কিনে দেবার জন্য সব সময় বায়না করতাম। পড়ার বইগুলো অমন দিলচসবী হয় না কেন?' এবার সুগতকিংকর যোগ করলো, —'জান, আমার কাকা ক্যানাডায় থাকেন। কাকা বলেছে ফরেন কাণ্ট্রিতে নাকি বাচ্চাদের সব বই কমিকসের মতই ইণ্টারেস্টিং করে লেখা হয়।' সায়ন্তনী আর এক ধাপ এগিয়ে বললো,—'জান আমাদের পড়ার বইগুলোও না ঠিক ঐ বুড়ো টীচারদের মত কালারলেস, একদম ড্রাই। আর সিলেবাসে একগাদা বই। ঐ ভারী বইখাতার ব্যাগ পিঠে নিয়ে,

হাতে ওয়াটার-বটল, ছাতা নিয়ে বাসে উঠতে এত কষ্ট হতো। একদিন তো স্কুল থেকে ফেরার পথে আমি বাস থেকে নামতে গিয়ে একদম ধপাস—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ।' সবাই হৈ হৈ করে বলে উঠলো, —'আমরাও পড়ে গেছি কতদিন। এই দেখ আমার কপালে কাটা দাগ, এই দেখ আমার হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল, এই দেখ আমার মাথা ফেটে গিয়েছিল, এই দেখো · ।' বিদ্যাসাগরের দয়ার শরীর বেদনায় কাঁপতে লাগলো। তিনি ম্লানমুখে স্বগোক্তি করলেন,— 'আহা ? এইরূপ দুগ্ধপোষ্য নাবালকদিগেরউপর এরূপ বৃহৎ বোঝা ন্যস্ত করা হয়েক কেন ?' দুষ্টু তমোঘ্ন বললো, —'কি যে বল। আমরা মোটেও দুগ্ধপোষ্য নই। আমরা তো ম্যাগি আর কমপ্লান খেতাম। বাড়ন্ত বাচ্চার মায়েরা যে শুধু তাই খেতে দেয়। আমিও একজন 'কমপ্লান বয়' তা জান ?' দীপান্বিতা, - 'আমিও একজন 'কমপ্লান গার্ল'। বিদ্যাসাগরের শব্দ দুটি বোধগম্য হল না। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তখন রামমোহন প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলেন, 'বৎসগণ ! তোমাদিগের বিদ্যার্জনের জন্য যে এত বৃহৎ পুস্তক তালিকা নির্ধারণ করা হইত তাহা অধ্যয়ন করিবার সময় কিরূপে পাইতে ?' অনির্বাণ জবাব দিল, —'সকালে ঘুম থেকে উঠেই তো পড়তে বসতে হতো, তখন মা পড়াত। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই আবার পড়তে বসে যেতে হতো, তখন প্রাইভেট টিউটর আসতেন। সপ্তাহে দু'দিন আবার কোচিংএ যেতে হতো। অবশ্য রাত ৮টা বাজলেই প্রাইভেট টিউটরকে চলে যেতে হ'তো। তখন টি. ভি সিরিয়াল শুরু হয় তো। তাই মা প্রাইভেট টিউটরকে বলে দিয়েছিল যে রাত ৮টা বাজার আগেই বাইরে টি ভি.র ঘর ছেড়ে দিতে হবে।' নীলাঞ্জনা, —'জান, এদিকে আবার ক্লাসে স্ট্যান্ড না করলেও মা বাবার বকুনি খেতে হবে। বল তো, সবাই কি স্ট্যান্ড করতে পারে ? কিন্তু মা বাবা বলবে যে অন্যরা পারে, তুমি কেন পারবে না। একেকদিন রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর আবার বাবা পড়াতে বসত। তখন আমার ঘুম পেয়ে যায়, —পড়া বলতে

না পারলেই বাবা মারতো মাথায় গাঁট্টা।' চিন্তিত মুখে রামমোহন,—'বালকবালিকাদিগের কিছুক্ষণ খেলাধুলা করাও তো খুবই আবশ্যক। কিন্তু তোমরা খেলাধুলার অবসর পাইতে কখন?'

ছেলেমেয়েরা সকলে একযোগে,—'আমরা খেলাধুলা করতাম না তো। প্লে-গ্রাউন্ড কোথায় যে খেলবো। ফ্ল্যাটের ঘরেও কোন খেলার জায়গা নাই। আমরা শুধু ছুটির দিনে টি ভি তে খেলা দেখতাম। আর যখন ক্রিকেট টেস্ট হতো বা এশিয়াড বা অলিম্পিক গেমস হতো তখন দেখতাম লাইভ টেলিকাস্ট। এবার যখন ইটালীতে ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল প্লে হচ্ছিল তখন তো বাবা মা, দাদু ঠাকুমা সকলেই রাত জেগে খেলা দেখতো আর ফ্লাস্ক থেকে মৌজসে চা ও কফি খেত। আমরাও একেকদিন দেখেছি। তখন মা আমাদেরও কফি খেতে দিত।' রামমোহন,—'সারারাত্রি এরূপ অনিদ্রায় যাপন করিয়া পরদিন বিদ্যালয়ে গিয়া নিদ্রাতুর বোধ হয় নাই?' অরিন্দম,—'একটুও না। তখন যে মারাদোনা, পেলে, চিমা, ব্রাজিল, জার্মানী, ইংলন্ড, আরজেণ্টিনা আমাদের ব্রেন একেবারে কাভার করেছিল। ঘুম আসবে কোথা দিয়ে।' রামমোহন ও বিদ্যাসাগর শূন্যদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। একটু পরে রামমোহন আবার কৌতূহল প্রকাশ করে প্রশ্ন করলেন,—'তোমাদিগের কথপোকথন থেকে অবগত হওয়া গেল যে যাত্রীবাহী মোটরযানে চড়িয়া তোমরা বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা করিতে, ইহার কি কারণ? তোমাদিগের নিকটবর্তী অঞ্চলে কি কোন বিদ্যালয় ছিল না যে স্থানে পদব্রজে যাওয়া যায়?' শুচিস্মিতা,—'ওমা তা থাকবে না কেন? কিন্তু সবাই কি সব স্কুলে চান্স পায়?' একেকজন নার্সারীর বাচ্চাকেও তো কত দূরের স্কুলে পড়তে যেতে হয়। তাছাড়া পাড়ার স্কুলে পড়ার কোন স্ট্যাটাস থাকে না। মা বাবা গর্ব করে বলতে পারে না তাদের ছেলেমেয়েরা কোন স্কুলে পড়ে।' বিদ্যাসাগর,—'এই চান্স পাওয়া

বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করা গেল না। ইহা বিশদভাবে বুঝাইয়া বল তো।'

বেদবতী,—'সে কি? চান্স পাওয়া মানেও জান না? ধর, পাঁচ হাজার গার্জেন ছেলেমেয়েকে ভর্তি করার জন্য এ্যাপ্লাই করলো। তারপর হবে বাচ্চার ও মা বাবার ইন্টারভিউ। শেষে ত্রিশজনকে এ্যাডমিশন দেওয়া হবে। এই ত্রিশজনের মধ্যে আবার দশজন থাকে স্পেশাল ক্যানডিডেট। লাক্ ফেভার করলে তবেই না ঐ ওয়ান—টুয়েন্টিয়েথ হওয়া যায়?' বিদ্যাসাগরের চোখে পারিজাত ফুলের লাল রঙ প্রায় হলুদ ঠেকতে লাগলো। তিনি ঊর্মিমালাকে কিছুটা বড় দেখে তার দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, —'পঞ্চাশের দশকের পর ভারতবর্ষ হইতে যে দেশনেতাগণ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট শুনিয়াছিলাম যে তত্রকার সংবিধানে নাকি নির্দেশিত করা হইয়াছে যে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকাগণ পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রে অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা হইবে। এতাদৃশ কর্মসূচী তবে কি কার্যকরী হয় নাই?' সুরঞ্জনা হাত ঝাঁকিয়ে জবাব দিল —'তা কি করে হবে? সবার জন্য তো এক স্ট্যান্ডার্ডের স্কুল হতে পারে না। যেমন ধর, মিডিল ক্লাস পিপলদের ছেলেমেয়েদের জন্য বোর্ড অব সেকেন্ডারীর স্কুল, অফিসার ও হাই সোসাইটির ছেলেমেয়েদের জন্য ইংলিশ মিডিয়াম কনভেন্ট স্কুল দিল্লী বোর্ডের আন্ডারে আর মিনিস্টার, বড় বড় ইন্ডাষ্ট্রিয়ালিস্টদের চিলড্রেনরা তো ফরেনে এডুকেশন নেয়।'

বিদ্যাসাগর,—'দরিদ্র বালকবালিকাগণ তাহা হইলে কোথায় অধ্যয়ন করে?'

সুপ্রবুদ্ধ,—'ওরা আবার পড়বে কি করে? পুওর পিপলদের তো অনেক ছেলেমেয়ে। কোন ফ্যামিলি প্ল্যানিং নেই। টি. ভি.তে এত পাবলিসিটি দেয় তাও করে না। ওদের খাওয়াই জোটে না তো এডুকেশন। ওদের ছেলেমেয়েরা বড় হওয়ার আগেই

রোজগার করার ধান্দায় লেগে যায়। ফ্যাক্টরীতে, কারখানায়, চা-দোকানে গেলে ওদের দেখতে পাবে। তাছাড়া অনেকের বাড়ীতেও বাচ্চা কাজের লোক রাখে। মাইনেও কম দিতে হয়, আবার কাজও বেশী পাওয়া যায়।' রামমোহন,—'তোমাদিগের ভাষা শুনিয়া অনুমান হয় যে তোমরা সম্ভবত ইংরাজী মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করিতে। বাঙালা ভাষায় ইংরাজী শব্দের এমত অনুপ্রবেশ নতুবা সম্ভবপর ছিল না।' বাণীব্রত হাসতে হাসতে উত্তর দিল,—'না না। আমরা সেকেন্ডারী বোর্ডের বাংলা স্কুলেই পড়তাম। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়লে তো বাংলা কথা বুঝতেই পারতাম না। যারা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে তারা মাকে বলে মাম্মী, বাবাকে বলে ড্যাডি। আর কাকা কাকীমা, মামা মামীমা, মেসো মাসী সকলকে বলে আংকল আর আন্টি।'

রামমোহন,—'তাহা হইলে বাঙালা বাক্যে এত ইংরাজী শব্দের প্রয়োগ কর কেন?' সাগরসৈকত,—'আজকাল সবই যে থ্রী ল্যাঙ্গুয়েজ ফরমুলায় হয়—ইংলিশ, হিন্দি ও একটি রিজিওন্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ। টি. ভি তেও সবসময় থ্রী ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম শুনি। এই খিচুরী ভাষাই এখনকার বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ। এই ভাষাতেই এখানকার বেঙ্গলি লিটারেচার লেখা হচ্ছে।'

সুমিলিতা পাল্টা প্রশ্ন করলো,—'আচ্ছা, তোমরা দুজনে যে ভাষায় কথা বলছো সেটাই কী স্যাংসক্রীট ল্যাঙ্গুয়েজ? এমন ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা শুনিনি কখনও।'

বিদ্যাসাগর,—'না মা, ইহা প্রাচীন বাঙলা ভাষা। আমাদিগের কালে দুই প্রকার বাঙালা ভাষা প্রচলিত ছিল, কথ্য ও লেখ্য। কথ্য ভাষাকে 'চলিত' ভাষা বলিয়াও অভিহিত করা হইত। অদ্য তোমাদিগের বাক্যালাপ শুনিয়া অনুমিত হয় যে বঙ্গদেশে সেই চলিত ভাষার পদভঙ্গ করিয়া সম্পূর্ণ অচল করা হইয়াছে এবং এক বর্ণসংকর ভাষার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে।' রামমোহন সংযোজন করলেন,—'হ্যাঁ, বাঙালা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাসেও বিভিন্ন যুগের ক্রমান্বয়ে

বিবর্তন ঘটিয়াছে। যেমন সর্বপ্রথম যুগকে বলা হয়েক 'প্রস্তর যুগ।' এই যুগে চর্যাপদ হইতে শুরু করিয়া জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ প্রস্তর খণ্ডকে ঘষিয়া অস্ত্র নির্মাণ করিবার ন্যায় সংস্কৃত ভাষাকে মর্দন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী যুগকে 'লৌহ যুগ' বলা হইয়া থাকে। আমা হইতে শুরু করিয়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ ভাষ্যকারগণের সময় কালকে এই যুগের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। লৌহপিণ্ডকে অগ্নিতে তরলায়িত করিয়া যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিবার পর যেরূপ কঠিন লৌহই থাকিয়া যায় সেইরূপ আমরা সংস্কৃত ভাষাকে সরলায়িত করিয়া যে বাঙালা গদ্যের উদ্ভব করিয়াছিলাম তাহা তৎসম ও তদ্ভব শব্দের সমারোহে লৌহসদৃশ অভেদ্য ভাষাই রহিয়া গিয়াছিল। ইহার পরের যুগ হইতেছে 'স্বর্ণ যুগ'। এই যুগে বাঙ্গালা ভাষা গদ্য, পদ্য, গীতিকবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি নানা অলংকারে ভূষিত হইয়া ওঠে। কিন্তু এই 'স্বর্ণ যুগে' বহু স্বর্ণকারের প্রবেশ ঘটিলেও কিরীটির কোহিনুর মণিটির মত রবীন্দ্রনাথ অপর সকলকে নিষ্প্রভ করিয়া আপন রশ্মি দেশ-বিদেশে বিচ্ছুরণ করেন বলিয়া শুনিয়াছি। স্বর্ণ যুগের পরবর্তী কাল আমরা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাই নাই। শুনিয়াছি যে ইহার পর বাংলা ভাষার 'প্লাস্টিক যুগ' শুরু হয়েক এবং বর্তমানে নাকি তাহা 'পলিথিন প্যাক' যুগে পর্যবসিত হইয়াছে। শোনা যায় যে, বর্তমান কালে ললাটেন্দু, নীলাকান্ত, অমরেশ প্রমুখ কথাকারগণ নাকি পলিপ্যাকে ভর্তি করিয়া 'ফান মাঞ্চ' নামক এক-প্রকার মুখরোচক গল্পকথা বাজারে বিক্রয় করা শুরু করিয়াছেন। বিশেষত, শারদীয়া বৃহৎ প্যাকে নাকি আলুর সহিত কচু, ওল ও কাঁচাকলা প্রভৃতি সস্তা ভাজা মিশাল দেওয়া হইয়া থাকে ও তাহা গরম গরম বিক্রয় হয়।' বিদ্যাসাগর—'যথার্থ, যথার্থ।'

দুই বৃদ্ধের কথার অর্থ উপলব্ধি না করতে পারলেও ছেলে-মেয়েরা ওদের শব্দের গমগমানিতে চুপ হয়ে গিয়েছিল।

রামমোহন কথা শেষ করতেই সাগরসৈকত বললো,—'দাদ্দু, তোমরা বড় স্ট্যাগনেন্ট। তোমরা এগিয়ে যাওয়া পছন্দ কর না। তাই তোমরা ভীষণ 'বোর' করে দাও। একেই তো বলে ইভলিউশন।'

রামমোহন বুঝলেন এবং বিদ্যাসাগরকে চোখের ইঙ্গিত করে বললেন,—'ওহে পণ্ডিত, এবার প্রস্থান করা যাউক। বালক-বালিকাগণ অতীতের প্রতি আস্থাশীল নহে। দোষ এই নাবালক-দিগের নহে। আমরাই তো পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম।' বিদ্যাসাগর,—'কিন্তু আমরা যে তথ্যটি অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে এ স্থানে আগমন করিয়াছি সেই অট্টালিকা ধসিয়া যাওয়ার বিষয়টি যে এতাবৎ শোনা হয় নাই।' ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে তিনি প্রশ্ন করলেন,—"বাছাগণ, তোমাদিগের বিদ্যালয়ের অট্টালিকা পতনের কারণ কি তোমরা অবগত আছ?' অনির্বাণ বললো,—'নিশ্চয়ই জানি। তবে ওটা স্কুলবাড়ী নয়। ঐ মালটিস্টোরে বিল্ডিং-এ আমাদের কোচিং সেন্টার ছিল। আমরা চল্লিশজন স্টুডেন্ট সেখানে পড়ছিলাম।'

বিদ্যাসাগর,—'কোচিং সেন্টার আবার কিরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান?'

সুপ্রবুদ্ধ,—'শুধু স্কুলে পড়ে তো আজকাল পাস করা যায় না। ভাল রেজাল্ট করতে হলে কোচিং সেন্টারে পড়তেই হয়। আমাদের স্কুলের একজন টীচার ঐ কোচিং সেন্টার খুলেছিলেন। সব টীচারদেরই প্রায় এরকম সেন্টার আছে। সপ্তাহে দুই দিন পড়ান, মাসে থ্রী হাণ্ড্রেড টিউশন ফী। প্রত্যেকদিন এইভাবে তিন চারটে করে সিফ্‌ট পড়ান! একেক সিফটে চল্লিশজন স্টুডেন্ট। সেদিন আমরা সন্ধ্যেবেলার সিফটে পড়ছিলাম, এমন সময় হুড়মুড় করে বাড়ীটা ভেঙ্গে পড়ল। তারপর আমরা সোজা এখানে চলে এলাম।'

রামমোহন আশ্চর্য হয়ে বললেন,—'গৃহটি কি অতীব পুরাতন

ছিল ?' ঊর্মিমালা,—'মোটেই না, একদম নিউ বিল্ডিং। এর বেস-মেণ্টে ছিল কার পার্কিং স্পেস। একেক ফ্লোরে চার পাঁচটা করে ফ্ল্যাট। আমাদের টীচার ফার্স্ট ফ্লোরে একটা ফ্ল্যাট ম্যানেজ করে কোচিং সেণ্টার খুলেছিলেন।'

রামমোহন,—'কিরূপে সেই ম্যানেজার শিক্ষক মহাশয় ফ্ল্যাটটি যোগাড় করিয়াছিলেন ?'

তমোঘ্ন, —'শুনেছিলাম যে প্রমোটারের ছেলেকে বিনা টিউশন ফীতে পড়িয়ে ফার্স্ট করে দেবেন বলে নাকি তিনি প্রমিশ করে-ছিলেন। তাই পাঁচ লাখের জায়গায় দুই লাখে ফ্ল্যাটটা পান।' রামমোহন, —'সেই শিক্ষক মহাশয় কোথায় ? তিনি তো তোমাদিগের সহিত আইসেন নাই। অট্টালিকা পতনের সময় তিনি কুত্র অবস্থান করিতেছিলেন ?'

দীপান্বিতা,—'তিনি তখন "আমি একটু আসছি, তোমরা পড়" বলে সিগারেট কিনতে রাস্তায় নেমে গিয়েছিলেন। তাই আমাদের সঙ্গে স্বর্গে আসতে পারেননি।'

বিদ্যাসাগর, —'পুণ্যবান ব্যক্তি বটেক।' বালকবালিকাদের কথা শুনে রামমোহনের পেটে তখন রাবড়ি ও ঘোলের সরবৎ ঘূর্ণায়মান হতে শুরু করেছে। তিনি আর দাঁড়াতে পারছিলেন না। ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করে বললেন,—'অদ্য এই স্থানেই ইতি হউক, বৎসগণ। তোমাদিগের সত্য জ্ঞান প্রাপ্তি দেখিয়া যারপর-নাই তৃপ্তি লাভ করিলাম। জ্ঞানাঞ্জনে তোমাদিগের চক্ষু শুধু উন্মীলিত হয় নাই, সবিশেষ বিস্ফারিত হইয়াছে দেখা যায়।'

তমোঘ্ন,—হ্যাঁ, এতো জেনারেল নলেজ।'

উভয়ে প্রস্থানোদ্যত হয়েছেন, এমন সময় মা সরস্বতী হন্তদন্ত হয়ে ছেলেমেয়েদের ডাকতে এলেন,—'কই সব সোনার বাছারা আমার! শীঘ্র চল সকলে। অমর্তলোকের চিকিৎসক অশ্বিনী-কুমারদ্বয় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। এস আমার সঙ্গে।'

রামমোহন তাঁকে দেখে বললেন,—'বাগদেবী মাতঃ! অদ্য এই

বালখিল্যদিগের প্রভূত বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় লাভ করিয়া আমরা বাক্যহারা হইয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আমরা যে আধুনিক শিক্ষার বীজ বপন করিয়াছিলাম, একবিংশ শতাব্দীর পূর্বক্ষণে তাহারা এরূপ সরস ফল প্রদান করিবে তাহা আমাদিগকে কল্পনার অতীত ছিল। আমরা ধন্য হইলাম।'

সরস্বতী,—'সত্যই ধন্যবাদার্হ আপনারা। তবে আপনাদের রোপন করা জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাইয়ে এদের যেভাবে অজ্ঞান তিমিরান্ধ করা হয়েছে তাতে স্বর্গের অশ্বিনীকুমারদ্বয় জ্ঞান না জানা প্রলেপ দিয়ে তা নিরাময় করতে পারবেন কি না তা সন্দেহ। তবু চেষ্টা করা যাক।'

ছাড়গাড়ী

পারুলবালা ফ্ল্যাটের দরজা দিয়ে ঢুকেই সরবে ঘোষণা করলো, —'পরশু ছনিবার কাজে আসতে পারবু নিকো বৌদিদি।' আমার স্বাভাবিক কারণেই ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো,—'কেন ?'

—'সিদিন ছাড়গাড়ী আছে যে গো তাই।' পারুলবালার মুখে খুসীর আভা আমার বিরক্তি আরও বাড়িয়ে দিল যেন। তবু রাগ চেপে রেখে নরম গলাতেই বলি,—'এই তো ক'দিন আগেই ছাড়গাড়ী আছে বলে ছুটী নিলে তুমি। আবার কিসের ?'

পারুলবালা ঘর মোছার বালতি ও ন্যাতা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে জবাব দিল,—'সিদিন তো অন্য দলের ছেল, পরশু আরেক দলের আছে যে, আই পাট্টির মিটিন আছে।' এবার আমার অবাক হবার পালা। বলি,—'সেকি কথা! তুমি কি সব দলেরই মেম্বার নাকি ?' পারুলবালা আমার অজ্ঞতা দেখে হাসে। উবু হয়ে বসে হাতের ন্যাতা টানতে টানতে বলে,—'তা নয়কো বৌদি। আমরা মুখ্যু গেরামের মানুষ, আমরা কি অতসত বুঝতি পারি। দল, পাট্টি, ভোটাভুটি এসব নিই আমাদির মাথা ঘামানর সময় কুথা ? আর ভোটে কে জিতল কে হারলি তাতিই বা আমাদির কি এল গেল গো, আমাদের অবস্থা তো যে ডাঙ্গায় ছেল সিখানেই রয়ি গেল।'

আমি টিপ্পনি কেটে বলি,—'কিন্তু তোমাদের উৎসাহেরও তো অন্ত দেখি না। দলে দলে মিটিঙ্গ শুনতে আস গাঁ ঝেঁটিয়ে।'

পারুলবালা বলে,—'আসলে কি জান, বৌদি ? দলের লোকরা যে গেরামের মানুষদের খেপ ধরে। সিই খেপে না এলি মহা ঝামেলা বাধি যায় যে। খুনখারাবি পর্যন্ত হয়ি যায়।' আমি আর বিস্ময় লুকোতে পারি না,—'গ্রামের মানুষদের খেপ ধরে, সে



তারপর হবে বাচ্চার মা বাবার ইন্টারভিউ

আবার কি জিনিষ পারুল ?' পারুলবালা উত্তর দেয়,—'সে তুমি আমাদের গাঁয়ে গেইলে বুঝিতি পারবি খুনি, বৌদি।'

পারুলবালার গ্রাম দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায়। বহুদিন ধরে সে কলকাতায় বাড়ীর কাজ করছে। ঐ অঞ্চল থেকে যে মেয়ে বৌরা বাড়ী বাড়ী কাজ করার জন্য আসে, পারুলবালা প্রায় তাদের নেত্রীর মত। এ পাড়ার সকলেই ওকে চেনে এবং একটু সমীহ করে চলে। কারণ পারুলবালাকে চটালে সহজে আর ঘরের কাজের লোক পাওয়া যাবে না। রোজ ভোরের লোকাল ট্রেনে করে আসে আবার সন্ধেবেলা ফিরে যায় ওরা। পারুলবালার গুণেরও অন্ত নাই। সকলের ঠ্যাকা বেঠ্যাকায় ও এসে কাজ তুলে দিয়ে যায়—রেশন তোলা, কেরোসিনের লাইন দেওয়া ইত্যাদি কোন কাজেই তার আপত্তি নাই বাড়তি দু/পাঁচ টাকা বেশী দিলে। কিন্তু ইদানিং সে ছাড়গাড়ী আছে বলে কাজে আসে না। অসুবিধে হলেও বলার সাহস হয় না কিছু। পারুলাবালা নিজে যদি কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে যে বিপদ। আমি তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি,—'হ্যাঁ পারুল, তা ছাড়গাড়ী থাকলে তুমি কাজে আসবে না কেন? ছাড়গাড়ীর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? তোমরা তো রোজই ট্রেনে আস।' পারুলবালা চোখ কপালে তুলে বলে,—'ওমা, সিদিন গাঁয়ের সব লোকরা আসবে যে গো। তাদের সঙ্গে থাকিতি হবি, ময়দানে যেতি হবি। ঐ যে বননু, সিদিন আই পার্টির বড় মিটিন আছে। তাই কাজে আসতে পারবু নি।'

—'পরশু ছাড়গাড়ী আছে, বড় মিটিঙ্গ আছে, এতসব কথা তুমি জানলে কি করে?' আমি প্রশ্ন না করে পারি না। পরুলবালা বিজ্ঞের মত জবাব দেয়,—'কেন, খপড়ের কাগজে দেখনিকো মিটিনের কথা? সিদিন বড় বড় মন্ত্রীরা বক্তিমে করবে যে।' আমার মনে পড়ল যে কাগজে দেখেছি বটে আগামী শনিবার এক রাজনৈতিক দলের ডাকা বিশাল জনসমাবেশের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আমি কিছুতেই ভেবে পাই না যে এই জনসমাবেশের

আয়োজকরা আগের থেকেই কি করে ভবিষ্যৎ-বাণী করে তা বিশাল হবে না ক্ষুদ্র হবে? গণতান্ত্রিক দেশে মিটিঙে যাওয়া না যাওয়া তো নির্ভর করে জনগণের মর্জির উপর। আজকাল কোন সাহিত্য সভা বা আলোচনা সভার আয়োজন করলে, বাড়ী বাড়ী গিয়ে কার্ড দিয়ে নেমতন্ন করে এলেও তো লোক জমান যায় না। সভার শেষে চা-পানের কথা উল্লেখ থাকলে হয়তো জনা কয়েক অত্যুৎসাহী লোক সেই সভার মান রক্ষা করে। অথচ রাজনৈতিক দলের নেতারা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দেওয়ালে দেওয়ালে ঘোষণা করে রাখে সেই বিশাল জনসভার আগাম সাফল্য। পারুলবালা এর রহস্য আমায় বুঝিয়ে দিল। কিন্তু আমার আশ্চর্য লাগলো এই ভেবে যে পারুলবালার তো অক্ষর পরিচয়ও হয় নি, নাম সই করতেও পারে না, তবু খবরের কাগজের খবর তো বেশ রাখে। ঠাট্টার সুরে বলি,—'তুমি রোজ খবরের কাগজ পড় বুঝি, পারুল?' পারুলবালা নিঃসঙ্কোচে জবাব দেয়,—'আমি কি করে কাগজ পড়ব গো বৌদি? আমি কি নেকাপড়া জানি? ঐ দলের নোকরা গাঁয়ে গিয়ি খপড় দেয় যে।'

—'রাখালের বাবা লেখাপড়া জানে?' রাখাল পারুলবালার বড় ছেলের নাম। স্বামীর সম্বন্ধে কোন কথা বলতে হলে সে রাখালের বাবা বলেই উল্লেখ করে। আমার প্রশ্নে সে মুখ ম্লান করে উত্তর দেয়, –'সিই বা জানবি কি করে গো? গেরামে কি আগে কোন ইস্কুল ছেল যে নেকাপড়া শিখবি? গেরামের পুরুষ মানুষরাই কেউ নেকাপড়া জানে না। তো আমরা। আজকাল হয়েছে ইস্কুল। আমার রাখাল তিন কেলাস পয্যন্ত পড়েছে। কিন্তু আর পড়াতে পারনু কই? তাকেও তো ঠাণ্ডা ঘরে আলু বাছার কাজে লাগানু।

আমি নিজের মনেই বলি,—'গাঁয়ের লোকেরা কেউ লেখাপড়া জানে না, নাম সই করতেও পারে না, ওরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটার। কি ভাবে যে ভোট দেয় ওরাই জানে।' আমার কথা শুনতে পেয়ে

পারুলবালা পেছন থেকে উত্তর দেয়,—'নাম সই করতি পারে না বুলেই তো ভোটের সময় টিপ ছাপ দিতি হয় গো বৌদি। ছবি দেখি ছাপ মারতি হয় ভোটের কাগজে! তুমি ভোট দাও নিকো ?'

—'ও বাব্বা'! আমি পারুলবালার রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান দেখে না হেসে পারি না। জিজ্ঞেস করি,—'আচ্ছা, ভোটার লিষ্টে তোমাদের নাম আছে কিনা সে সমস্ত খবর জানতে পার কেমন করে ? অনেক সময় তো নাম ঠিকমত ওঠে না, উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়। সে সব খোঁজ রাখ কি করে ?' পারুলের তৎক্ষণাৎ জবাব,—'তার জন্য আমাদের মাথা ব্যথা করার কি দরকার আছে গো ? দলের নোকরাই ভোটের আগে গেরামে যায় আর বলে আসে লিষ্টিতে কার কি নাম আছে। কি নামে ভোট দিতি হবি।'

—'তার মানে ?' পারুলের কথার অর্থ আমার ঠিক বোধগম্য হল না,—'কি নামে ভোট দিতে হবে মানে ? ভোটার লিষ্টে নাম আবার বারে বারে পাল্টায় নাকি ?' আমি বিস্মিত হয়ে বলি। পারুলবালা হাসে,—'আমাদের নামের কি কোন ধরতি আছে গো বৌদিদি ? নাম দিয়ি কাম কি ? সেই দশ বছর বয়সে বিয়া হইল আর বার বছর বয়সে আমার রাখাল হলু। সেই থিকি তো রাখালের মা বুইলে গাঁয়ে সকলে ডাকে।'

—'তা ভোটার লিষ্টেও কি তোমার নাম রাখালের মা ?' আমার প্রশ্নে পারুলবালাই অবাক হয়,—'ওমা তা হতি যাবি কেন ? এই তো গেলবার ভোটের লিষ্টিতে নাম ছিইল পদ্মরাণী। আরেকবার ভোট দিনু কমলা দাসী নামে। সগ্গলেরই অমন নাম হয়।'

—'কিন্তু তোমার নাম তো পারুলবালা। তুমি পদ্মরাণী, কমলাদাসী এসব নামে ভোট দিলে কি করে ?' পারুলবালা হাসতে হাসতেই জবাব দিল,—'আমার এই নামটা তো দিইল ঐ বাড়ীর মাসীমা। যখন পেরথম এ পাড়ায় কাজ ধরনু তখন মাসীমা নাম জিগলে বননু রাখালের মা বুইলে ডাকবেন কুনি। তা মাসীমার

ভাসুরেরের নাম নাকি রাখালবন্ধু। তাই তিনিই তখন বুইলেন যে ঐ নামে ডাকতি পারবেন না, পারুলবালা বুইলে ডাকবেন। সিই থিকি এ পাড়ায় সকলে পারুলবালা বুইলে ডাকে।' রসিকতা করে পারুলবালা যোগ করলো,—'এই যেমন বন্ন চোরা ফল হয় নাগো বৌদিদি, আমরা তেমনি নামচোরা। যখন যে নাম দাও, তাই ধরি। বাপ মায়ের দেয়া নাম কি আর মনে আছে গো?'

—'কিন্তু পারুল, ভোটার লিস্টে তো স্বামীর নাম থাকে। ভোট দেবার সময় স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করে না তোমাদের?'

—'তা করে না আবার? কিন্তু জিগলে বলি, সোয়ামীর নাম ধরতি পারব নাকো। তখন ভোটের আপিসারবাবুরাই কোন একটা নাম ধরে জিগায়, কি ঘনশ্যাম? আমি ঘাড় নেড়ে বনন্ হুঁ। তেণারা লিষ্টিতে টিক দিয়ে তখন আঙ্গুলে ছাপ দি দ্যায় আর ঘরে গে ভোট দিই এনু।' পারুলবালার কথা শুনে আমার কৌতুহল তীব্র হতে থাকে। জিজ্ঞেস করি,—হ্যাঁগো, পারুলবালা! এই যে তুমি এত আগ্রহ নিয়ে ভোট দাও তাকি তোমার নিজের মত অনুসারে দাও? মানে তুমি কি বুঝে সুঝে ভোট দাও যে কাকে ভোট দিচ্ছ? কেন তাকে ভোট দিচ্ছ?' পারুলবালা উত্তর দেয়, —'সে সব কি আমরা বুঝতি পারি বৌদি? আমরা তো নোকটারে চিনিই না, তো বুঝব কি? কত্তা যারে দিতি কয় তারেই ভোট দিই।'

—'কিন্তু তোমার কর্তা যাকে দিতে বলবে তাকেই তুমি ভোট দেবে কেন পারুল? তোমার নিজের কোন মতামত নাই? পছন্দ অপছন্দ নাই? তবে কেন তোমাকেও আলাদা করে ভোটার করা হয়েছে?' আমি ওকে বোঝানর চেষ্টা করি। পারুলবালা হাত ঘুরিয়ে বলে,—'আমাদের আবার মতামত কিগো বৌদিমণি? যার শাঁখা যার সিন্দুর মতও তার। কত্তাই বুইলে দ্যায় কোন ছবিতি ছাপ মারতি হবি, সিখেনেই আমি ছাপ মারি আসি।" আমি আরও একটু বিশদভাবে জানার জন্য বললাম,—'তোমাদের গ্রামের সব বৌ মেয়েরাই কি এইভাবে ভোট দেয়? নিজেদের কোন মতামত নাই?'

—'তা নয় তো আবার কি ? গেরামের মেয়ে বৌরা কি তোমাদের মত সোয়ামীর সমান বিদ্যে ধরে গো যে নিজের মতে চলবি ? তাদের গতরে শক্তি থাকলি কি হবি মগজে তো তোমাদের মত বুদ্ধি নাই কো যে এসব বুঝবি।' পারুলবালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়। আমি তবু হাল ছাড়ি না। পারুলবালাকে আমি নারী প্রগতির আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলতে চাইলাম। তাই মন্ত্র দেবার মত ভঙ্গিতে বলি,—'দেখ পারুল, তোমার স্বামী তো তোমার খাওয়া পরার দায়িত্ব টুকুও পালন করে না। তোমাকে গতরে খেটে রোজগার করতে হয়। সারাদিন খাট। তবুও তুমি স্বামীর মতে চলবে কেন ? তাকে অত মান্যই বা কর কেন, বলতো ?' পারুলবালার গলায় এবার বেদনার সুর ফুটে উঠলো, 'তা বুললি কি হবে বৌদি ? সেই মুনিস্যিটাও কি সারাদিন কম খাটে গো ? দিনভর মজুরে খাটে, ক্ষেত মজুরের কাম করে, ঘরামির কাম করে, তবু চলে কই ? আট জনার পেট ভরান কি কম কতা গো ? বড় ছেলে রাখালও কাম করে। বড় মেয়ে দুটারেও বাড়ীর কামে দিইচি। তাও হয় না। জমি নাই ঘর নাই, আমাদের জেবনের কি আছে বল ? এই গতরটাই সম্বল।'

পারুলের কথা আমার মনকে স্পর্শ করে। কিছুদিন আগে ও যখন আমার কাছে একশ টাকা মাইনে দেবার কথা বলেছিল তখন আমি ভীষণ বিরক্ত হয়েছিলাম। তবুও আমি আশি টাকা থেকে যে ওর মাইনে যে একশ টাকা করেছি তা ওর ন্যায্য প্রাপ্য মনে করে নয়, ভয়ে। পাছে কাজ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু আমি সহানুভূতি দেখানর বদলে ঝাঁঝের সঙ্গে বললাম,—'তোমাদের দুঃখ কষ্ট যখন দূর হয় না, অবস্থার পরিবর্তন হয় না তখন এত দলবাজি, রাজনীতি করতে যাও কেন ?' পারুলবালা এবার খ্যাঁক খ্যাঁক করে বলে উঠলো,—'আমরা কেন দলবাজি করতি যাব গো ? আমরা রাজনীতি ফাজনীতির কি বুঝি ?'

—'তুমি না কর, রাখালের বাবা তো করে নিশ্চয় ? তার এতে

কি সুবিধে হয়েছে?' পারুলবালা আর্তনাদের সুরে উত্তর দিল,—'রাখালের বাবাও এসব করে নাগো বৌদিদি। গেরামের নোকদের মাথায় কি এত বুদ্ধি হতে পারে? তাদির সময়ই বা কুথায়? ঐ যে বননু খেপ ধরে, সেই খেপে না গেলি যে গেরামে বাস করা মুসিকল হয়ি যায়। নইলে ইচ্ছা করি এসব ঝামেলা কে নিতি চায় বল তো? পেটের ধান্দায় সবাই মরতিছে।'

—'এই খেপ ধরা ব্যাপারটা কি আমায় পরিষ্কার করে বল তো পারুল?' আমি ভাল করে বোঝার জন্য জিজ্ঞেস করি। পারুলবালা জ্ঞানদানের ভঙ্গিতে আমাকে বোঝায়,—'খেপ ধরা কি বুঝাতি পারছ না? মিটিনে নোক নাগে তো ভিড় নাগে। তাই দলের নোকরা গেরামে গিয়ি নোক ধরে। ঐ যেমন পুকুরে জাল ফেলি মাছ ধরে না গো, ঠিক তেমনি গেরামের মোড়লকে দেয়ি নোক ধরে। মোড়লের সঙ্গে চুক্তি করি আসে নোক জোগাড় করার জন্যি। মোড়ল হুকুম দিয়ে দ্যায় যে ছেলি বুড়ো, বৌ বেটী সগ্গলেরে কলকেতায় যাতি হবি অমুক দিন। না গেলি বিপদ হবি। তাই তো সগ্গলে আসে গো সিদিন।' পারুলবালা এবার আমার সামনে এসে ফিস ফিস করে বলে,—'আসলে কি জান? ট্যাকা দ্যায় যে, মাথা পিছু সগ্গলেরে ট্যাকা দেয়। নইলে রোজগার ফেলি কে আসবে বল? দিন আনা দিন খাওয়া চলবি কিসে?' পারুলবালার কথায় আমার চক্ষু স্থির হয়ে যায়। আমি তাও জিজ্ঞেস করি, —'আর এই যে ছাড়গাড়ী, ছাড়গাড়ী বল রোজ,—এটা তবে কি?'

—'উদিন রেলগাড়ীতে ভাড়া লাগে না যে, ছাড় দ্যায়। টিকিট-বাবুরা তো জানে যে এই লোকরা কলকাতায় মিছিল করতি যাছে, দলেব মিটিনে যাছে, তাই কিছু বলে না। লোকদের হাতের ঝাণ্ডা দেখি রেলের বাবুরা বুঝি যায়। গেরামে বাসও যায় লোক আনতি। তাতেও অনেকে আসে। বাসেও ভাড়া লাগে না সিদিন, সব ছাড়।'

পারুলবালার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। হাত ও মুখ প্রায় একই সঙ্গে চলছিল ওর। রান্না ঘরে বাসন মুছে ও তাকের উপর গুছিয়ে রাখছিল। আমি আমার শেষ কৌতুহলটা মিটিয়ে নেবার জন্য প্রশ্ন করলাম, —'তা হ্যাঁ পারুল, গ্রামের লোকরা তো লেখাপড়া জানে না বললে, কিন্তু ওরা যে দলে দলে সব মিটিঙ্গে বক্তৃতা শুনতে আসে, সেই সব কথা কি ওরা বুঝতে পারে? নেতারা কোন আদর্শের কথা বলছে, কোন নীতির কথা বর্ণনা করছে তাকি ধরতে পারে?' এবার মুচকি হেসে পারুলবালা আমার সব জিজ্ঞাসা নিরসন করে জবাব দিল, —'তোমার যেমন কতা বউদি। শহরের লেকাপড়া জানা লোকদের ভাষা ওরা বুঝতি পারে নাকি? ওরা বাক্তিমে কি বুঝবে বল তো? নেতারা, মন্ত্রীরা বাক্তিমে দ্যায় ওরা তাদের দ্যাখে। ওসব বড় বড় কতার মানে জানাবি কি করে? ওরা তো সব কলকেতা শহর দেখতি আসে। বেলায় বেলায় এসি কেউ কেউ গঙ্গায় ডুব দ্যায়, কালীঘাটে মাকে দশশন করে, পুজা দ্যায়। কেউ কেউ আবার ছেলিপুলিদের চিড়িয়াখানা দেখাতি নে যায়, মেমরাণীর মন্দির দ্যাখায়, হাইকোট, আজভবন সব ঘুরি ঘুরি দ্যাখে সারাদিন। তারপর মিটিনের শেষে সাঁঝের বেলা ঘরে ফিরবার আগে ধম্মতলায় চাঁদনী বাজারে সস্তায় পুরানো জামা কাপড় কিংবা ঘর গেরস্তালির জিনিষ পত্তর দুই একটা কিনি নে যায়। গাঁটের কড়ি খচ্চা করি গাঁয়ের লোকজন কি কলকেতা শহর দেখাত পারত সবাই? দলের লোকদের দয়ায় এই যে কলকেতা শহর দেখল, গঙ্গায় চান করল, কালীঘাট মহাতীর্থ দশশন করল, পুজা দিল, এটা কি কম হ'ল বৌদিদি?'

* * * *

মিটিঙ্গের পরদিন সকালে মাংসের দোকানের এক কসাই এক পাল ছাগল ভেড়া নিয়ে ময়দানে চড়াতে এসেছিল। সারা ময়দানে ছেঁড়া কাগজের টুকরো, বাদামের খোলা, পোড়া বিড়ি, দেশলাই মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে ছিল। সেই ঘাস খেতে খেতে একটা কচি

পাঁঠা একটি দাড়িওয়ালা বুড়ো ভেড়াকে জিজ্ঞেস করলো,—'হ্যাঁ দাদু! আজ ঘাসগুলো খেতে এমন লাগছে কেন বল তো?' বুড়ো ভেড়া দাড়ি দুলিয়ে জবাব দিল,—'বুঝলি না, এই ঘাসগুলোতে যে কালকে বিশাল জনতান্ত্রিক সস্ মাখানো হয়েছে। তাই এমন লাগছে।' কচি পাঁঠাটা বিরক্তির সুরে বললো,—'এই সসমাখাবার দরকার কি ছিল বাপু? একদম বিশ্রী লাগছে খেতে। খেয়ে পেট ফেট খারাপ করে যদি? ফুড পয়জন হবে না তো?' বুড়ো ভেড়াটা ধমক দিয়ে উঠলো,—'চুপ কর ছোঁড়া! এমনিতেই তো ঐ কসাইটার হাতে জবাই হবি কাল, আজ তোর ফুড পয়জন হলে বেশী ক্ষতি কি হবে রে? খা, খেয়ে যা চুপচাপ। মরার আগে অন্তত পেটটা তো ভরুক।' কচি পাঁঠাটা এবার কাঁদ কাঁদ গলায় বুড়ো ভেড়াকে বললো,—'দাদু! আমরা জাতিতে ছাগল বলেই কি এত দুঃখ আমাদের? এমন অসহায় অবস্থায় বাঁচতে হয়, মরতে হয়?' বুড়ো ভেড়া কচি পাঁঠাটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো,—'নারে বোকা! ভারতবর্ষের মানুষগুলোরও এই হাল। ওদের নেতাগুলোও ঐ কসাইটার মত লোকগুলোকে প্রথমে গণতন্ত্রের ঘাস খাওয়ায় তারপর জবাই করে।'